ভারতীয় উপমহাদেশের
আহলেহাদীছগণের

অগ্রণী ভূমিকা

মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

অনুবাদ
নূরুল ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা

মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা সহকারী
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

Contents

ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা

برصغير ميں اہل حديث كي اوّليات

মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

শ্যামলবাংলা একাডেমী

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী

এসবিএ প্রকাশনা-১৪

মোবাইল নং : ০১৭১৭-৮৬৫২১৯

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৫

ফাল্গুন ১৪১৮

জুমাদাল উলা ১৪৩৩

প্রচ্ছদ

সুলতান

কালার গ্রাফিক্স

গোরহাঙ্গা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র

VAROTIO UPAMAHADESHER AHLEHADEESGANER AGRANI VUMICA

Written by **Muhammad Ishaque Vatti,** Translated by **Nurul Islam**. 1st edition : March 2015. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi. Fixed Price : Tk. 70 (Seventy) & US $ 2 Only.

সূচিপত্র

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের নিবেদন

যে কোন কাজ সর্বপ্রথম সম্পাদন করা এক অনন্য কীর্তির স্মারক। যুগ যুগ ব্যাপী এ জাতীয় কর্মকাণ্ড ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে লিপিবদ্ধ থাকে। দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য, জ্ঞান-গরিমা, গভীর অধ্যবসায়, সর্বোপরি ইখলাছ বা নিষ্ঠার সাথে যারা কাজ করেন তাদের মাথায় এ মর্যাদার মুকুট শোভা পায়।

অগ্রগণ্যতা ও অগ্রগামিতার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা হল- 'মুহাজির ও আনছারদের মাঝে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহাসাফল্য' *(তওবা ৯/১০০)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(হাদীদ ৫৭/১০)*। তাছাড়া মহান আল্লাহ কা'বাকে পৃথিবীর 'সর্বপ্রথম গৃহ' হিসাবে আখ্যায়িত করে তার মর্যাদা ও অগ্রগামিতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন সুন্দর নিয়ম চালু করল, তার জন্য তার ছওয়াব এবং তার পর যারা তার উপরে আমল করবে তাদের ছওয়াব রয়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াবের কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করল, তার উপরে তার গুনাহ এবং তার পরে যারা তার উপরে আমল করবে তাদের গুনাহ রয়েছে। অথচ তাদের গুনাহে একটুও কম করা হবে না' *(মুসলিম হা/১০১৭, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়)*। উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীছ থেকে অগ্রগণ্যতার গুরুত্ব ও মর্যাদা আমাদের নিকট সমুদ্ভাসিত হয়ে যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইসলামের প্রচার-প্রসারে তারা সর্বদা অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। কুরআন ও হাদীছের মর্মবাণীকে অবিমিশ্ররূপে জনসম্মুখে তুলে ধরার কৃতিত্ব

তাদের মর্যাদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাদের অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ইংরেজরা তাদেরকে অবদমিত করার জন্য যুলুম-নির্যাতনের স্টীম-রোলার চালিয়েছিল। সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করেছিল। শাহাদাত লাভ থেকে বঞ্চিত করার জন্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করেছিল। জেলখানার নিভৃত প্রকোষ্ঠে অনেককে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়েছিল। তবুও তারা দখলদার ইংরেজ শক্তির কাছে মাথানত করেননি।

বালাকোট যুদ্ধের অগ্রনায়ক শাহ ইসমাঈল শহীদের সমাজ সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলন সারা ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করেছিল। তাঁরই স্মৃতিধন্য ছাদেকপুরী পরিবারের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। এতকিছুর পরেও ইতিহাসের চোরাগলিতে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে আহলেহাদীছগণের সোনালী ইতিহাস। প্রকৃত ইতিহাসকে করা হয়েছে কালিমালিপ্ত। তাদের কৃতিত্বকে ম্লান করার জন্য এবং তাদেরকে ইংরেজদের সেবাদাস প্রমাণের জন্য চলেছে এবং চলছে অবিরাম প্রচেষ্টা। কিন্তু সত্য সেতো তার আপন আলোয় উদ্ভাসিত হবেই। তাকে অবদমিত করার সাধ্য কার আছে?

বরেণ্য ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ **'বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আওয়ালিয়াত'** গ্রন্থে আহলেহাদীছগণের ৯ প্রকার অগ্রগণ্য কৃতিত্ব আলোচনা করেছেন। কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর, হাদীছের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, বাহাছ-মুনাযারা, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আরবী সাহিত্য চর্চা, উর্দূ থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ, কুরআন ও হাদীছের হিন্দী অনুবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকাই এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী এতদ্বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ *(মূল উর্দূ গ্রন্থের ভূমিকা পৃঃ ২৭ দ্র.)*। যারা বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের কোন অবদান নেই- তাদের বিবেকের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিবে এ গ্রন্থটি। যেসব জ্ঞানপাপী আহলেহাদীছগণকে কাদিয়ানী বলতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন হবে। বিদগ্ধ পাঠক আহলেহাদীছগণের কৃতিত্বের স্মারক অনেক অজানা ইতিহাস জেনে ঋদ্ধ হবেন। আর আহলেহাদীছগণ তাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস জেনে উজ্জীবিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অবদান সম্পর্কে উর্দূতে অনেক বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টির এই বইটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এতে উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের আম অবদান আলোচনা করা হয়নি। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আহলেহাদীছগণ যে যে কাজটি সর্বাগ্রে করেছেন তা এখানে বিবৃত হয়েছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এরূপ চমৎকার বিষয়সংবলিত পুস্তকের অনুবাদ বাংলাভাষীদের সামনে উপস্থাপনা করা সময়ের অনিবার্য দাবী ছিল। সেজন্যই আমরা এটির অনুবাদে হাত দিয়েছি। আমাদের জানা মতে ইসহাক ভাট্টির কোন বই এই প্রথম বাংলায় অনূদিত হল। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ আমাকে এটি অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

ইতিপূর্বে মাসিক **আত-তাহরীক**-এ এর ১ম পাঁচটি অধ্যায়ের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে (জুন-ডিসেম্বর ২০১৪ ও জানুয়ারী ২০১৫) প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। আহলেহাদীছগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ হবে বলে বিদগ্ধজনেরা মত প্রকাশ করেছেন। সেজন্য আমরা অন্যান্য অধ্যায়ের অনুবাদ সম্পন্ন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

লেখকের অনুমতি ও মতামত নেয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে অধ্যয়নরত বন্ধুবর আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে লেখককে বিষয়টি অবগত করালে তিনি দারুণ খুশি হন। তিনি বলেন, 'এটা তো আমার জন্য সুসংবাদ। এমন শুভ কাজের জন্য অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে কেবল একটি কপি দিলেই কৃতজ্ঞ থাকব' *(দ্র. 'মাওলানা ইসহাক ভাট্টির সাথে কিছুক্ষণ', তাওহীদের ডাক, ২১তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৫, পৃঃ ৪৩)*। সেই সাথে তিনি আমার জন্য উক্ত বইয়ের একটি কপিও হাদিয়া পাঠান। জাযাহুল্লাহু খায়রান। তাঁর এই উদারতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং আহলেহাদীছগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে আরো বেশী গবেষণা করার তৌফিক দান করুন! আর অধম অনুবাদকের এ সামান্য প্রচেষ্টাটুকু আল্লাহ কবুল করুন! আমীন!!

নওদাপাড়া, রাজশাহী **-খাকসার অনুবাদক**
১০ই মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, লেখক ও আহলেহাদীছ ঐতিহ্যের শিকড়সন্ধানী গবেষক। এই বরেণ্য কলমসৈনিক আহলেহাদীছ মনীষীদের জীবনী এবং উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অবিরাম লিখে চলেছেন। সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে এ সম্পর্কে এতো বেশী কেউ লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সঙ্গতকারণেই তিনি 'মুয়ার্রিখে আহলেহাদীছ' (আহলেহাদীছগণের ঐতিহাসিক) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

ইসহাক ভাট্টি ১৯২৫ সালের ১৫ই মার্চ ফরীদকোট রাজ্যের 'কোট কাপূরা'য় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মিয়াঁ আব্দুল মাজীদ এবং দাদার নাম মিয়াঁ মুহাম্মাদ। ৮ বছর বয়সে দাদার কাছে কুরআন মাজীদ পড়ার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। তিনি ভাট্টিকে ত্রিশতম পারার ১০/১২টি সূরা মুখস্থ করান এবং কতিপয় উর্দূ গ্রন্থ পড়ান।

১৯৩৩ সালে ভাট্টি যখন চতুর্থ জামা'আতের ছাত্র ছিলেন, তখন দাদা তাঁকে প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর নিকট নিয়ে যান এবং কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানান। ভাট্টি তাঁর কাছে কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও সুলাইমান মানছূরপুরীর 'রহমাতুল্লিল আলামীন' পড়েন। অতঃপর তাফসীর, হাদীছ ও প্রচলিত জ্ঞানের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। বুলূগুল মারাম থেকে শুরু করে ছহীহুল বুখারী পর্যন্ত হাদীছ গ্রন্থাবলী তিনি তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেন। ভূজিয়ানী তাঁকে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করতেন ও ভালবাসতেন। ভাট্টি বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। আল্লাহ আমাকে যা কিছু দান করেছেন তা তাঁরই শুভ প্রচেষ্টার ফসল'। মাওলানা মুহাম্মাদ শফী হোশিয়ারপুরী এবং মাওলানা ছানাউল্লাহ হোশিয়ারপুরীর নিকটেও তিনি কিছু ফুনূন-এর কিতাব পড়েন।

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর কাছে পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁরই নির্দেশে ১৯৪০ সালে তিনি গুজরানওয়ালায় যান। সেখানে দু'বছর অবস্থান করে সে যুগের অন্যতম সেরা দু'জন মুহাদ্দিছ মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর নিকট ছহীহুল বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ফারেগ হন।

ফারেগ হওয়ার পর একটি অফিসে ক্লার্কের চাকুরীর মাধ্যমে ভাট্টি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। এরপর ১৯৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত 'মারকাযুল ইসলাম' মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ফরীদকোট জেলে বন্দী হন। তিনি ১৯৩৯ সালে প্রথম কারাবন্দী হন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ২১শে আগস্ট ভোর ৫-টায় তিনি ট্রাকযোগে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যা ৮-টায় কাছূর পৌঁছেন। এর ঠিক ১ মাস পর ১৯৪৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁর পিতাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও আত্মীয়স্বজন কোট কাপূরা থেকে রওয়ানা হয়ে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গোণ্ডাসিংওয়ালায় পৌঁছেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে তিনি স্বপরিবারে চক নম্বর ৫৩, জিবি মানছূরপুর (তহসিল জাড়াওয়ালা, যেলা ফায়ছালাবাদ) গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ভাট্টির পরিবার ভারতে থাকা অবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু দেশ ত্যাগের পর প্রায় রিক্তহস্তে তারা পাকিস্তানে আসেন। তাই পরিবারের আর্থিক যোগান দান ও জীবন-জীবিকার তাগিদে ভাট্টি চাষাবাদ ও ব্যবসায় নিয়োজিত হন।

১৯৪৮ সালের ৮ই জুলাই মাওলানা ভাট্টির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর সাথে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি জমঈয়তের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর তিনি জমঈয়তের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ বছর ৮ দিন এ গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। পাকিস্তানের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা দাঊদ গযনভীর সাথে তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতের উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে নিরলসভাবে কাজ করে যান। ১৯৪৯ সালে জমঈয়তের যুবশাখা 'জমঈয়তে তলাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠিত হলে ভাট্টি অন্যদের সাথে পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করে আহলেহাদীছ ছাত্র-যুবকদেরকে জাগিয়ে তোলেন।

১৯৪৯ সালের ১৯শে আগস্ট জমঈয়তের মুখপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' চালু হলে মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভীকে এর সম্পাদক নিযুক্ত

করা হয়। কিছুদিন পর ভাট্টিকে পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করে গুজরানওয়ালায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি একই সাথে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও ই'তিছামের সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৫১ সালের ১৫ই মে মাওলানা হানীফ নাদভী 'ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া'য় যোগদান করলে ভাট্টির উপর পত্রিকা সম্পাদনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৫২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জমঈয়তের কেন্দ্রীয় কার্যালয় গুজরানওয়ালা থেকে লাহোরে স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানে চলে আসেন।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারীতে ভাট্টি আল-ই'তিছাম ত্যাগ করে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহযোগিতায় লাহোর থেকে 'মিনহাজ' নামে একটি পত্রিকা চালু করেন। ১৪ মাস চলার পর ১৯৫৯ সালের এপ্রিলে এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। মাওলানা দাঊদ গযনভীর নির্দেশে ১ বছর ৩ মাস পর আবার ই'তিছামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ২৪শে জুলাই জমঈয়ত প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে ১৯৬৫ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত তিনি মারকাযী জমঈয়তের সাথে যুক্ত থাকেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি জমঈয়তের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, আল-ই'তিছাম-এর সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ৩০শে মে 'আল-ই'তিছাম'-এর সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। এরপর প্রফেসর আবু বকর গযনভীর সাথে পরামর্শ করে দাঊদ গযনভী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' পুনঃ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভাট্টি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের জুলাইয়ে তাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর এখান থেকেও তিনি আলাদা হয়ে যান।

১৯৬৫ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি সরকারী প্রতিষ্ঠান ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়ায় যোগ দেন। ১৯৯৬ সালের ১৬ই মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি এখানে গবেষক হিসাবে কাজ করেন। ২২ বছর ইদারা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'আল-মা'আরিফ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পাকিস্তান রেডিওতে ভাট্টির প্রথম আলোচনা প্রচার হয়। এরপর ৩৪ বছর এই সিলসিলা চলতে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসংখ্য আলোচনা প্রচার হয়। তিনি দ্বিতীয় পাকিস্তানী আহলেহাদীছ, যিনি রেডিওতে আলোচনার সুযোগ পান। ইতিপূর্বে মাওলানা হানীফ নাদভীকে

আলোচনার জন্য রেডিওতে আমন্ত্রণ জানানো হত। ১৯৭২ সালের ২৭শে জুলাই টেলিভিশনে তিনি প্রথম আলোচনা করেন। কয়েক বছর এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এরপর তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আহলেহাদীছ মনীষীদের জীবনী তাঁর লেখালেখির অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এই অশীতিপর কলামিস্টের কলম এখনো সরব রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক *(৯ম অধ্যায়ে তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা দ্র.)*। এ যাবৎ তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাযার পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিছু কথা

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের কর্মপরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন), গ্রন্থ রচনা ও সংকলন, ওয়ায ও ভাষণ এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্র সমূহে এই জামা'আতের আলেমগণ অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এই অকিঞ্চন অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করে নিজের সীমিত জ্ঞান অনুযায়ী তাদের বিচিত্র অবদানগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এই ছোট্ট গ্রন্থটিও সেই প্রচেষ্টার সামান্য আভাস মাত্র।

কিছুদিন পূর্বের কথা। আমি কুয়েতে যাই এবং সেখানে এক বৈঠকে আলাপচারিতার সময় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের কিছু অগ্রগণ্য কৃতিত্ব উল্লেখ করি। ঐ বৈঠকে আমার প্রিয় বন্ধু মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী এবং মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদও উপস্থিত ছিলেন। এই দু'জন অনেক দিন যাবৎ কুয়েতে অবস্থান করছেন এবং সেখানে তাদের নিবেদিতপ্রাণ আলেম সহকর্মীদের সাথে পূর্ণোদ্যমে দ্বীনী খিদতম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদীর পৈত্রিক নিবাস পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা শহরে এবং মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদের পৈত্রিক নিবাস ভারতের উত্তর প্রদেশের বলরামপুর যেলার উনারহুওয়া গ্রামে। আমি আমার 'দাবিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদের এবং 'গুলিস্তানে হাদীছ'-এ মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। আমার জানা মতে এরা আহলেহাদীছ মাসলাকের অনেক বড় মুবাল্লিগ এবং এর প্রচার-প্রসারে সর্বদা সচেষ্ট।

আমার কথা শুনে এই দুই প্রিয় বন্ধু আমাকে আহলেহাদীছগণের ঐ সকল অগ্রগণ্য কৃতিত্ব গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে বলেন, যেগুলো আমার অবগতিতে রয়েছে। আমি এতে সম্মতি প্রকাশ করলেও অন্যান্য লৈখিক ব্যস্ততার কারণে তা বাস্তবে রূপলাভ করতে পারেনি। অতঃপর ২০১১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমার ডান হাতের হাড্ডি ভেঙ্গে যায় এবং লেখালেখির গতি থমকে দাঁড়ায়।

প্রাইভেট হাসপাতালে অপারেশন করানো হয় এবং ৬ সপ্তাহের জন্য হাত প্লাস্টার করে রাখতে হয়। প্লাস্টার খুলে ফেলার পরেও কলম ধরার শক্তি ছিল

না। ইত্যবসরে মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী কুয়েত থেকে দেশে আসেন এবং গুজরানওয়ালার ডা. তাহের মুনীর বিরয়াহ্র সাথে আলাপ করেন। যার গোন্দলাওয়ালা রোডে অর্থোপেডিক্স ক্লিনিক রয়েছে। তিনি এই রোগের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারী মুহতারাম হাজী আব্দুল্লাহ কাওছার (যিনি ডাক্তার ছাহেবের শ্বশুর) গুজরানওয়ালা থেকে গাড়ি নিয়ে আসেন এবং আমাকে ডাক্তার ছাহেবের ক্লিনিকে নিয়ে যান। জানা যায় যে, হাড্ডি জোড়া লেগে গেছে। ডাক্তার ছাহেব কিছু ঔষধ দেন এবং হাতের ব্যায়াম করার তাকীদ দেন। এভাবে ১৫ দিন পরপর হাজী আব্দুল্লাহ কাওছার ছাহেব গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যায় রেখে যেতেন।

অতঃপর আল্লাহ্র অপার করুণায় ২০১২ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারীর (অর্থাৎ ৫ মাস) পর থেকে কলম মোটামুটি ধরতে সক্ষম হই। হাতে কিছুটা শক্তি পেলে ১৫/২০ দিনের মধ্যে আহলেহাদীছগণের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব সম্পর্কে কিছু কথা লিপিবদ্ধ করে ফেলি। কমবেশি এখনও ব্যথা আছে। কিন্তু আল্লাহ্র মেহেরবানীতে কাজ হচ্ছে।

আমি যা কিছু লিখি তা আলেম-ওলামা এবং আল্লাহ্র দ্বীনের মুবাল্লিগদের জীবনী ও অবদান। এই গুনাহগারের দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ চাহে তো এই জীবনীগুলোর বরকতে আল্লাহ্র দরবারে এর ফরিয়াদ শোনা যাবে এবং আল্লাহ্র রহমতে যাবতীয় সৎকর্ম সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে।

আমি এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের ৯ প্রকার অগ্রগণ্য কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ করেছি। এ বিষয়ে উর্দূতে এ ধরনের গ্রন্থ এটিই প্রথম। যদি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এর বিষয়বস্তুর সাথে একমত হন এবং ইলমী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে উপকারী মনে করেন, তাহলে এই অধম ও তাঁর মৃত পিতা-মাতার জন্য নেক দো‘আ করবেন।

মুহতারাম শায়খ ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ ‘কিতাব আওর মুছান্নিফে কিতাব মেরী নযর মেঁ’ (আমার দৃষ্টিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার) শিরোনামে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। এজন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞভাজন। ভূমিকায় তিনি আমার সম্পর্কে যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর সুধারণা।

অনেকেই অনেক কিছু লিখছেন। আমিও আমার জ্ঞান অনুযায়ী কমবেশি লেখার চেষ্টা করে থাকি। পাঠকবৃন্দ তাতে আস্থা প্রকাশ করেন। এই অধমের প্রতি এটা তাদের মেহেরবানী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুখে রাখুন!

অধম বান্দা
মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি
জিন্নাহ স্ট্রীট, ইসলামিয়া কলোনী
সান্দা, লাহোর
টেলিফোন : ০৪২-৩৭১৪৩৬৭৭
১লা মার্চ ২০১২ খ্রিঃ
৭ই রবীউল আখের ১৪৩৩ হিজরী

১ম অধ্যায়

কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর

এই পৃথিবীতে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি দেশকে (পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ) একসাথে 'বার্রে ছাগীর' (উপমহাদেশ) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই তিনটি দেশ অসংখ্য মাযহাবের চিত্তাকর্ষক স্থান। এখানে প্রত্যেক মাযহাবের লোকজন নিজ নিজ তরীকা অনুযায়ী ইবাদত করার ব্যাপারে স্বাধীন। এ উপমহাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ৬০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ২৫ কোটির মতো ভারতে, ২০ কোটির কাছাকাছি বাংলাদেশে এবং ১৮ কোটি মুসলমান পাকিস্তানে বসবাস করছে। মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছ, হানাফী (দেওবন্দী, ব্রেলভী), মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী, শী'আ সব মাযহাবের মানুষই শামিল আছে এবং নিজেদের আক্বীদা ও ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে আহলেহাদীছগণের খিদমত সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাচ্ছি এবং বলতে চাচ্ছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জ্ঞান-গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় তাদের কী কী অগ্রগণ্য কৃতিত্ব রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টার পরিধি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। সর্বাগ্রে কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তাদের অবদান আলোচনা করছি এবং এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে এই হেদায়াতের গ্রন্থের অনুবাদ ও তাফসীরে আহলেহাদীছ আলেমগণ কী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তাদের কী অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট করার পূর্বে সামান্য ভূমিকা।

কুরআন মাজীদের তাফসীরের সূচনা :

ছাহাবীগণের যুগে আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদের তাফসীরের সূচনা হয়। সূচনালগ্নে সংক্ষিপ্তাকারে তাফসীর করা হত। পরবর্তীতে এ বিষয়ে অসংখ্য বড় বড় তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, ফার্সীই প্রথম অনারব ভাষা যাতে ছাহাবীগণের যুগে কুরআন মাজীদ অনুবাদের সিলসিলা শুরু হয়েছিল। আল্লামা সারাখসীর অভিমত হল সালমান ফারেসী (রাঃ) পারস্যবাসীদের জন্য প্রথম সূরা ফাতিহার ফার্সী অনুবাদ করেন।[১] তবে

১. আল-মাবসূত (১/৩৭, মিসরীয় ছাপা)-এর বরাতে মূযিহুল কুরআন-এর টীকা, পৃঃ ১২।

ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন মাজীদের কিছু সূরার (যেমন সূরা ইয়াসীন) সর্বপ্রথম অনুবাদ সিন্ধী ভাষায় হয়।[২]

শায়খ শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃঃ ৮৪৯ হিঃ/১৪৪৫ খ্রিঃ) 'বাহরে মাওওয়াজ' (بحر موّاج) নামে ফার্সী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন ও তাফসীর লিখেন। কিন্তু এটা কুরআনের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ ও তাফসীর ছিল। পুরা কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর ছিল না।

শায়খ আলী মুত্তাক্বী (মৃঃ ২রা জুমাদাল উলা ৯৭৫ হিঃ/৪ঠা নভেম্বর ১৫৮৭ খ্রিঃ) উপমহাদেশের অনেক বড় আলেম ও লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর 'শুউনুল মুনায্যালাত' (شئون المنزلات) গ্রন্থে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও স্থান উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে কিছু শব্দ ও আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থটি পুরা কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরের মর্যাদা লাভ করেনি।

ভারতবর্ষের চতুর্থ মোগল বাদশাহ নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর গুজরাটের কাঠিওয়াড়ের মুহাম্মাদ বিন জালালুদ্দীন হাসানী গুজরাটী নামের এক আলেমকে কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, শাব্দিক ও বোধগম্য অনুবাদ হতে হবে। অনুবাদের কোন শব্দ যেন কুরআনের শব্দের চেয়ে বেশী না হয়।[৩] বাদশাহ্র নির্দেশ মোতাবেক অনুবাদ হয়েছিল কি-না তা জানা যায় না। যদি হয়েই থাকে তাহলে এই অনুবাদ কোথাও মওজুদ আছে, না নাই? আমাদের জানা মতে এই অনুবাদটি কোথাও নেই।

ভূমিকামূলক একথাটুকুর পর এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে যে, উপমহাদেশে পুরা কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর সর্বপ্রথম কোন আলেমগণ করেছিলেন। আর সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছিল এবং অদ্যাবধি প্রকাশনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষেরা সীমাহীন উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।-

২. বিস্তারিত দেখুন : ফুকাহায়ে হিন্দ ১/৮৯-৯১।
৩. নুযহাতুল খাওয়াতির ৫/১২১।

ফার্সী অনুবাদ :

শায়খ নূহ বিন নে'মতুল্লাহ সিন্ধী ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আলেম, যিনি পুরা কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করেন ও তাফসীর লিখেন। তিনি সিন্ধু প্রদেশের হালাকান্দী গ্রামের বাসিন্দা এবং সমকালীন খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তিনি ৯৯৮ হিজরীর ২৬শে যুলকা'দায় (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৫৯০ খ্রিঃ) স্বীয় বাসস্থান হালাকান্দীতে মৃত্যুবরণ করেন। পনেরশত হিজরী উপলক্ষে ১৪০১ হিজরীতে এই ফার্সী অনুবাদটি সিন্ধী সাহিত্য পরিষদ, হায়দারাবাদ, জামশুরু (সিন্ধু) প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ফার্সী অনুবাদক হলেন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী। তাঁর অনুবাদ ও তাফসীরের নাম 'ফাতহুর রহমান' (فتح الرحمن)।[৪] উপমহাদেশের অগণিত প্রকাশক অসংখ্যবার এই অনুবাদটি প্রকাশ করেছে। ওলামায়ে কেরামের মাঝে এটি দারুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং বহুলপঠিত হয়েছে। উপমহাদেশের সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এটাকে বিশুদ্ধতম অনুবাদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং সর্বশ্রেণীর আলেমগণ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

উপমহাদেশে উছূলে তাফসীর বিষয়েও 'আল-ফাওযুল কাবীর' নামে ফার্সী ভাষায় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীই সর্বপ্রথম গ্রন্থ লিখেন।[৫] এই গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই অধ্যায় সমূহে শরী'আতের বিধি-বিধান, মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদী ও নাছারাদের সাথে বিতর্ক, আল্লাহ্র নে'মত সমূহ, ঘটনাসমূহ, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কিত বিদ্যা, সূরাসমূহ অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

---

৪. এই অনুবাদ করার অপরাধে (!) দিল্লীর দুষ্ট আলেমরা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যার ফৎওয়া জারি করে এবং লোকজনকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় *(দ্র.ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খ্রিঃ), পৃঃ ১১, আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৪৬)*।-অনুবাদক।।

৫. আযহারী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী এটিকে আরবীতে রূপান্তর করেন। তবে চতুর্থ অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদ المقطعات القرآنية বা 'কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ' অংশটুকুর আরবী অনুবাদ করেন মাওলানা ই'যায আলী দেওবন্দী *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৭)*।-অনুবাদক।

‘আল-ফাওযুল কাবীর’ গ্রন্থটি রচনার কারণ সম্পর্কে শাহ ছাহেব বলেন, যখন এই অধমের (অলিউল্লাহ) জন্য আল্লাহ কুরআন মাজীদ অনুধাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তখন মনের মধ্যে এই ইচ্ছা জাগল যে, কিছু উপকারী এমন সূক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করব যা কুরআন মাজীদ অনুধাবন ও গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষদের জন্য উপকারী বিবেচিত হবে। মূলত এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শাহ ছাহেবের আরবী ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থের নাম ‘ফাতহুল খাবীর’ (فتح الخبير)। এটি কুরআন মাজীদের কঠিন ও বিরল শব্দের ব্যাখ্যা। এতে ঐ সমস্ত প্রায় সকল বিষয় পরিপূর্ণরূপে একত্রিত করা হয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এটিও উপমহাদেশের এই মহান লেখকের এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ। তিনি ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৩ খ্রিঃ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭২ হিজরীর ২৯শে মুহাররম (২০শে আগস্ট ১৭৬২ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৬]

শাহ অলিউল্লাহ্র পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী ‘তাফসীরে ফাতহুল আযীয’ নামে ফার্সীতে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেছেন। যেটি ‘তাফসীরে আযীযী’ (تفسير عزيزى) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের গণ্ডগোলের সময় হারিয়ে গেছে। স্রেফ ১ম ও শেষ খণ্ড দু’টি অবশিষ্ট রয়ে গেছে।[৭] প্রথম খণ্ডটি সূরা ফাতেহা থেকে সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত সোয়া দুই পারার এবং অন্য খণ্ডটি শেষ দুই পারার (ঊনত্রিশ ও ত্রিশ) তাফসীরকে শামিল করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ফার্সী ভাষায় এটিই প্রথম বিস্তারিত তাফসীর ছিল। দুঃখের বিষয় হ’ল এটি কালের লুটতরাজের শিকার হয়েছে। শাহ আব্দুল আযীযের এই কুরআনী খিদমত ছাড়াও তাঁর এক ছাত্র তাঁর দরসে কুরআনকে লিপিবদ্ধ করে সূরা মুমিনূন

---

৬. শাহ অলিউল্লাহ ‘যাহরাওয়াইনে’ (زهراوين) নামে সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীরও লিপিবদ্ধ করেছেন *(দ্র. আবুল হাসান নাদভী, তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত ৫/৪০৫)*। -অনুবাদক।

৭. নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/২৭৩।

থেকে সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ পারার তাফসীর সংকলন করেছেন।[৮] যা 'পাঞ্জে পারা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

শাহ আব্দুল আযীয ১১৫৯ হিজরীর ২২শে রামাযানে (২৭শে নভেম্বর ১৭৪৬ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৯ বছর বয়সে ১২৩৮ হিজরীর ৭ই শাওয়ালে (১৭ই জুলাই ১৮২৩ খ্রিঃ) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এত লোক সমাগম হয়েছিল যে, ৫৫ বার তাঁর জানাযা পড়া হয়। এটাও সম্ভবত উপমহাদেশের এক আহলেহাদীছ আলেমের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আমার জানা নেই যে, এর পূর্বে বা পরে কোন আলেমের জানাযা এতবার পড়া হয়েছে।

উপমহাদেশে পাঞ্জাব প্রদেশের যেই আলেম পুরা কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদ করেন তিনি হলেন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী। ধারাবাহিকতার দিক থেকে হাফেয ছাহেব উপমহাদেশে কুরআন মাজীদের তৃতীয় ফার্সী অনুবাদক ও মুফাসসির। 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' (تفسير محمدي) নামে তিনি এই খিদমত আঞ্জাম দেন। এটি বড় সাইজের আড়াই হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। ১২৮৬ হিজরীতে তিনি এই তাফসীর লিখা শুরু করেন এবং ১২৯৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সমাপ্ত হয়। পুরা দশ বছর (১৮৬৯-১৮৭৯ খ্রিঃ) তিনি এই কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন ছিলেন।

হাফেয লাক্ষাবীর রচনা পদ্ধতি ছিল এরূপ- তিনি প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার নীচে পাঞ্জাবী অনুবাদ এবং তার নীচে ফার্সী অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সেটিকে শাহ অলিউল্লাহ্‌র অনুবাদ বলে আখ্যা দিতেন। অথচ সবাই জানে যে, শব্দের পরিবর্তনের নামই অনুবাদ। একটি অনুবাদের শব্দ পরিবর্তনের ফলে আরেকটি অনুবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। যেকোন ভাষায় যত অনুবাদ হয়েছে তা সব শাব্দিক পরিবর্তনেরই ফসল। শাহ ছাহেবের অনুবাদের শাব্দিক পরিবর্তনের ফলে তা হাফেয লাক্ষাবীর অনুবাদে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি সেটিকে নিজের (ফার্সী) অনুবাদ বলে দাবী করতেন না; বরং শাহ ছাহেবের অনুবাদ বলে আখ্যা দিতেন। এটা তাঁর বিনয়।

---

৮. শাহ আব্দুল আযীযের ছাত্র রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী 'ইফাদাতে আযীযিয়া ওয়া তাহকীকাতে নাফীসাহ' নামে এটি সংকলন করেন *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১৩)*।-অনুবাদক।

পাঞ্জাবী অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হল, এটা শাহ রফীউদ্দীনের উর্দূ তরজমার পাঞ্জাবী তরজমা। এটাকেও তাঁর বিনয়ই বলা চলে। মূলত ঘটনা এই যে, হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী দুই ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেছেন। একটি ফার্সী এবং একটি পাঞ্জাবী ভাষায়। এভাবে তিনি ভারতবর্ষের তৃতীয় এবং অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রথম আলেম, যিনি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তিন ধরনের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১. ফার্সী অনুবাদ ২. পাঞ্জাবী অনুবাদ ও ৩. পাঞ্জাবী পদ্যে কুরআনের তাফসীর। যা বড় সাইজের ৭টি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং আড়াই হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী।

হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী বর্তমান ভৌগলিক মানচিত্র অনুযায়ী ভারতের ফিরোযপুর (পূর্ব পাঞ্জাব) যেলার ছোট্ট গ্রাম 'লাক্ষৌকে'তে ১২২১ হিজরীর (১৮০৭ খ্রিঃ) কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন এবং উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। পড়াশোনার গভীরতা এত ব্যাপক ছিল যে, মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী তাঁকে 'লাইব্রেরী' বলে ডাকতেন। হাফেয মুহাম্মাদের দাদা হাফেয আহমাদ নিজ ছোট্ট গ্রাম 'লাক্ষৌকেতে' 'দারুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা চালু করেছিলেন। হাফেয মুহাম্মাদ ১৮৪০ সালের দিকে এর নাম রাখেন 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া'। যেখানে অসংখ্য আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেছে। দেশ বিভাগের পর এই মাদরাসাটি 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া' নামে উকাড়াতে স্থানান্তরিত হয়। এর অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ছিলেন হাফেয ছাহেবের প্রপৌত্র মাওলানা মঈনুদ্দীন লাক্ষাবী (মৃঃ ৯ই ডিসেম্বর ২০১১/১৩ই মুহাররম ১৪৩৩ হিঃ)। হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী অনেক গ্রন্থের লেখক ছিলেন। ১৩১১ হিজরীর ছফর মাসের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) তিনি নিজ বাসস্থান লাক্ষৌকেতে ইন্তেকাল করেন।

ফার্সী ভাষায় কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত একটি কাজ জামে'আ দারুল উলূম গাওয়াড়ী (বেলুচিস্তান)-এর হাজী খলীলুর রহমান করেছেন। তিনি ৬২টি ফার্সী কবিতায় কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে এটা এমন একটি কাজ যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তিনি ১৩২৩ হিজরীর ২০শে জুমাদাল আখেরাহ (২২শে আগস্ট ১৯০৫ খ্রিঃ) বেলুচিস্তানের 'বালগার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৭১ বছর বয়সে ১৩৯৬ হিজরীতে (১৯৭৬ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীর :

এবার কুরআন মাজীদের উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীরের দিকে আসুন! শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর স্বনামধন্য পুত্র শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী কুরআন মাজীদের প্রথম উর্দূ অনুবাদ করেন এবং 'মূযিহুল কুরআন' (موضح القرآن) নামে তাফসীর লিখেন। ১২০৫ হিজরীতে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। সাইয়িদ আব্দুল হাই হাসানী স্বীয় পিতা সাইয়িদ ফখরুদ্দীন হাসানীর কিতাব 'সেপাহর জাহাঁ তাব' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী স্বপ্নে দেখেন তার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বড় ভাই শাহ আব্দুল আযীযের নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেন। শাহ আব্দুল আযীয বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে অহী অবতীর্ণের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। তবে নিঃসন্দেহে স্বপ্ন সত্য। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কুরআন মাজীদের খিদমত করার এমন তৌফিক দান করবেন যা ইতিপূর্বে কারো ভাগ্যে জোটেনি।[৯] বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর 'মূযিহুল কুরআন' লেখার তৌফিক দেন। যার দ্বারা লক্ষ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ উপকৃত হওয়ার এই সিলসিলা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

কোন কোন গবেষক শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীকৃত অনুবাদকে কুরআনের প্রথম উর্দূ অনুবাদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল প্রথম উর্দূ অনুবাদ শাহ আব্দুল কাদের কৃত। যার একটি প্রমাণ তাঁর এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা। শাহ আব্দুল কাদের ১১৬৩ বা ১১৬৪ হিজরীতে (১৭৫০ বা ১৭৫১ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩০ হিজরীর ১৯শে রজব (২৭শে জুন ১৮১৫) মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ ভাষায় কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় অনুবাদ করেন শাহ আব্দুল কাদেরের বড় ভাই শাহ রফীউদ্দীন। শাহ আব্দুল কাদেরের অনুবাদের মতো এই অনুবাদও দারুণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁর সময় উর্দূ ভাষা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং সেই সময় অন্য কোন ভাষার গ্রন্থকে উর্দূতে রূপান্তর করা খুবই কঠিন ছিল। বিশেষত কুরআন মাজীদের অনুবাদ ছিল খুবই

---

৯. নুযহাতুল খাওয়াতির ৭/২৯৫।

স্পর্শকাতর বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই বুযুর্গানে দ্বীনকে তৌফিক দেন এবং এই কঠিনতম পর্বের অবসান ঘটে। শাহ রফীউদ্দীন মা'কূলাত ও মানকূলাতে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কবিতা ও কাব্যচর্চার সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি ১১৬২ হিজরীতে (১৭৪৯ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৩ হিজরীর ৬ই শাওয়াল (৯ই আগস্ট ১৮১৮ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন।

শাহ রফীউদ্দীনের মৃত্যুর ২২ বছর পর তদীয় কুরআনের অনুবাদ ১২৫২ হিজরীতে (১৮৪০ খ্রিঃ) প্রথমবারের মতো কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর অনেক প্রকাশক একাধিকবার এটি প্রকাশ করেছেন এবং এখনো প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ এটিকে কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে আলাদাভাবে প্রকাশ করেছেন এবং কেউ কেউ অন্য কোন অনুবাদকের অনুবাদের সাথে প্রকাশ করেছেন। কোন এক সময়ে বড় সাইজে তিনটি অনুবাদ একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে প্রথমত শাহ অলিউল্লাহ্র ফার্সী অনুবাদ, দ্বিতীয়ত শাহ রফীউদ্দীনের উর্দূ অনুবাদ এবং তৃতীয়ত শাহ আব্দুল কাদেরের উর্দূ অনুবাদ ছিল। এভাবে তিন পিতা-পুত্রের একত্রিত অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং এটাকে 'তিন তরজমাওয়ালা কুরআন মাজীদ' বলা হত। এই কুরআন মাজীদ আমার দাদার (মিয়াঁ মুহাম্মাদ) নিকট ছিল এবং তিনি প্রত্যেকদিন সকাল বেলায় কুরআনের ঐ কপিই তেলাওয়াত করতেন।

মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ফার্সী অনুবাদ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী এবং প্রথম উর্দূ অনুবাদ তাঁর পুত্রদ্বয় করেছিলেন। তাঁদের পরে অনেক আলেম কুরআনের অনুবাদ করেছেন। ডেপুটি নাযীর আহমাদ স্বীয় অনূদিত কুরআনের ভূমিকায় লিখছেন-

---

১০. এই তিনটি অনুবাদের মূল পাণ্ডুলিপি শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক দেহলভীর নিকট সংরক্ষিত ছিল। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মাওলানা বেলায়াত আলী ছাদেকপুরী তাঁর নিকট উক্ত অনুবাদত্রয় প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং ইসহাক দেহলভীর ছাত্র রফীউদ্দীন বর্ধমানীকে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে রাযী করান। ফলে বর্ধমানী ১০ হাযার রূপী দিয়ে একটি নতুন প্রেস ক্রয় করে নিজ খরচে উক্ত অনুবাদ তিনটি প্রকাশ করেন *(দ্র. গোলাম রসূল মেহের, জামা'আতে মুজাহিদীন, পৃঃ ২৯৭-৩০১; জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ১৮-১৯)*।-অনুবাদক।

'যখন এক সাথে একটি বংশের তিন তিনটি অনুবাদ মানুষেরা পেয়ে গেল। একটি শাহ অলিউল্লাহকৃত ফার্সী অনুবাদ এবং শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীন কৃত দু'দুটি উর্দূ অনুবাদ, তখন সবার অনুবাদ করার সাহস সৃষ্টি হল। কিন্তু অলিউল্লাহ পরিবার ছাড়া কোন ব্যক্তি কুরআনের অনুবাদক হওয়ার দাবী করতে পারে না। তারা কস্মিনকালেও কুরআনের অনুবাদক নন; বরং শাহ অলিউল্লাহ ও তাঁর পুত্রদের অনুবাদের অনুবাদক। তারা তাদের অনুবাদে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আগপিছ করে নতুন অনুবাদের নাম দিয়েছে'।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের কুরআনী খিদমত :

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভারতীয় উপমহাদেশের বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই লিখেছেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, ইতিহাস, আক্বাইদ, কবিতা ও কাব্যচর্চা, সাহিত্য, নৈতিকতা, তাছাওউফ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিরোনামে ৩২৩টি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধুমাত্র কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর ৭টি গ্রন্থ আছে। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. ফাতহুল বায়ান ফী মাকাছিদিল কুরআন : এটি আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদের তাফসীর। প্রথমে এটি ৪ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং নওয়াব ছাহেবের জীবদ্দশাতেই ভূপালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হওয়ার পর নওয়াব ছাহেব এর বিভিন্ন জায়গায় বহু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। ফলে এ তাফসীরের পরিধি গিয়ে দাঁড়ায় ১০ খণ্ডে। অতঃপর নিজেই এটিকে মিসর থেকে ছাপান। এটি বড় সাইজের চার হাযার পৃষ্ঠার অধিক।

২. তারজুমানুল কুরআন বিলাতায়িফিল বায়ান : এই তাফসীরটি উর্দূ ভাষায় রচিত ও ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত।

৩. তাযকীরুল কুল বিতাফসীরিল ফাতিহা ও আরবা' কুল : এটি উর্দূ ভাষায় সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাসের তাফসীর।

৪. নায়লুল মারাম মিন তাফসীরি আয়াতিল আহকাম : এটি আরবী ভাষায় রচিত এবং কুরআন মাজীদের শারঈ বিধি-বিধান সম্পর্কিত ২৩৬টি আয়াতের তাফসীর।

৫. ফাছলুল খিতাব ফী ফাযলিল কিতাব : এটি উর্দূ ভাষায় রচিত। এতে কুরআন মাজীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে এটি এক অনন্য গ্রন্থ।

৬. ইকসীর ফী উছূলিত তাফসীর : এই গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ফার্সী ভাষায় রচিত।[১১] প্রথম খণ্ডে তাফসীর গ্রন্থাবলীর পরিচয় পেশ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মুফাসসিরদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের একজন আহলেহাদীছ লেখক রচিত এ বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ।

৭. ইফাদাতুশ শুয়ূখ বিমিকদারিন নাসিখ ওয়াল মানসূখ : এটিও ফার্সী ভাষায় রচিত এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কুরআনের আয়াত সমূহের নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) এবং দ্বিতীয় খণ্ডে হাদীছের নাসিখ-মানসূখ উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন বিষয়ে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের এই ৭টি গ্রন্থের মধ্যে কিছু আরবীতে, কিছু ফার্সীতে এবং কিছু উর্দূতে রচিত। অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কিত বিষয়ে নওয়াব ছাহেব তিন ভাষাতেই লিখেছেন এবং অত্যন্ত তাহকীক করে লিখেছেন। এই ৭টি গ্রন্থ কলেবরের দিক থেকে ১০ হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। কুরআন সম্পর্কে নওয়াব ছাহেবের এটি বড় খিদমত, যা তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আলেম ছিলেন, যিনি কুরআন মাজীদ সম্পর্কে এত বিস্তারিত লিখেছেন।

নওয়াব ছাহেব ১২৪৮ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল উলাতে (১৩ই নভেম্বর ১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৭ হিজরীর ২৯শে জুমাদাল আখেরায় (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯০ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদীর তাফসীর :

ভারতের ইউপি'র (উত্তর প্রদেশ) বিভিন্ন শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন। যারা সর্বদা নিজেদেরকে জ্ঞান-গবেষণায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এই আলেমদের মধ্যে সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদীর নামও শামিল রয়েছে। যিনি লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু দূরে

---

১১. সাইয়িদ নূরুল হাসান হুসাইনী এটিকে আরবীতে রূপান্তর করেছেন *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২৪)*।-অনুবাদক।

অবস্থিত মালীহাবাদ নামক এক গ্রামে ১২৭৪ হিজরীতে (১৮৫৮ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' (تفسير مواهب الرحمن) নামে ৩০ খণ্ডে কুরআন মাজীদের ত্রিশ পারার তাফসীর লিখেন। যা প্রথমবার নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়।[১২] অতঃপর ১০টি বৃহৎ খণ্ডে এটি ছাপানো হয়। এই খণ্ডগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮১২। ইউপির তিনিই প্রথম আলেম, যাকে আল্লাহ তা'আলা এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' ছাড়াও ফায়যীর নুকতাবিহীন তাফসীর 'সাওয়াতিউল ইলহাম' (سواطع الإلهام)-এর উপর নুকতাবিহীন ভূমিকা লিখেছেন। তিনিই প্রথম আলেম যিনি এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ করেছেন। 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' ও 'সাওয়াতিউল ইলহাম' দু'টিই নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী ১৩৩৭ হিজরীতে (১৯১৯ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী :

ডেপুটি সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী ১২৫৮ হিজরীতে (১৮৪২ খ্রিঃ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন এবং গ্রন্থ রচনা ও দ্বীনী খিদমতে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লীর তিনিই প্রথম আলেম, যিনি উর্দূ ভাষায় 'আহসানুত তাফাসীর' (أحسن التفاسير) নামে ৭ খণ্ডে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন। যা দুই হাযার ৫৬২ পৃষ্ঠা ব্যাপী। সম্মানিত মুফাসসিরের জীবদ্দশায় ১৩২৫ হিজরীতে (১৯০৮ খ্রিঃ) প্রথমবার এটি দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

---

১২. তিনি নওলকিশোর নামক এক হিন্দু ব্যক্তির অনুরোধে এই তাফসীরটি রচনা করেন। ১৯০২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, উক্ত হিন্দুর নামেই প্রতিষ্ঠিত নওলকিশোর প্রেস ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি এই প্রেস থেকে হাদীছ, ফিক্বহ ও তাফসীরের শত শত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। মালীহাবাদীর তাফসীরটি ছাপতে পারার কারণে প্রেস মালিক নওলকিশোর গর্ববোধ করতেন। কারণ তার ধারণা এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের দারুণ উপকার করেছেন *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৩৫)*।-অনুবাদক।

কুরআন মাজীদের আয়াতের অর্থ শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী কৃত অনুবাদ থেকে গৃহীত।

১৪১৬ হিজরীতে (১৯৯৬ খ্রিঃ) এই তাফসীরটি মাকতাবা সালাফিয়া, শীশমহল রোড, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এতে বর্ণিত হাদীছগুলোর তাখরীজ করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীদের নির্ঘণ্ট তৈরী করা হয়েছে। যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সন্নিবেশিত আছে। ডেপুটি সাইয়িদ আহমাদ হাসান দেহলভী প্রায় ৮০ বছর বয়সে ১৩৩৮ হিজরীর ১৮ই জুমাদাল আখেরায় (৯ই মার্চ ১৯২০ খ্রিঃ) এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে স্থায়ী জগতে পাড়ি জমান।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কুরআনী খিদমত :

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী অবিভক্ত পাঞ্জাবের প্রথম আলেমে দ্বীন, যিনি উর্দূ ভাষায় 'তাফসীরে ছানাঈ'(تفسير ثنائى) নামে পুরা কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেন। এই তাফসীরটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত। ১৮৯৫ সালে (১৩১৩ হিঃ) এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং শেষ খণ্ড ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে (২৯শে রামাযান ১৩৪৯ হিঃ) সমাপ্ত হয়।[১৩] এতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুফাসসির উপযুক্ত স্থান সমূহে স্বীয় যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে (খ্রিস্টান, আর্য সমাজ, কাদিয়ানী, শী'আ, প্রকৃতিবাদী, হাদীছ অস্বীকারকারী প্রভৃতি) সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। অন্য কথায়, মাওলানা তাঁর তাফসীরে নিজস্ব খাছ তার্কিক ধাঁচ বজায় রেখেছেন এবং মানুষদেরকে কুরআনী বিধি-বিধান ও ইসলামের মূলনীতি সমূহ বুঝানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী বিধি-বিধানের উপর আরোপিত অভিযোগ সমূহের জবাব দিয়েছেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে মাওলানা অমৃতসরী আরবী ভাষায় দু'টি তাফসীর লিখেন। একটি আরবী তাফসীরের নাম 'তাফসীরুল কুরআন বিকালামির রহমান'

---

১৩. এই তাফসীরের ভূমিকায় মাওলানা অমৃতসরী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর তাফসীর প্রকাশিত হওয়ার পর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 'বায়ানুল কুরআন' লিখেন এবং তাঁর তাফসীর দ্বারা প্রভাবিত হন *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১)*।-অনুবাদক।

(تفسير القرآن بكلام الرحمن) অর্থাৎ কুরআনের আয়াত দিয়ে কুরআনের তাফসীর। এ বিষয়ে এটি এক অনন্য তাফসীর, যা ১৯০৩ সালে (১৩২১ হিঃ) প্রকাশিত হয়।[১৪] এটি প্রথম আরবী তাফসীর, যা অবিভক্ত পাঞ্জাবের একজন আলেম লিখেন। দ্বিতীয় আরবী তাফসীরের নাম হল 'বায়ানুল ফুরকান আলা ইলমিল বায়ান' (بيان الفرقان على علم البيان)। এই তাফসীরটি মাওলানা ইলমে মা'আনী ও বায়ানের (অলংকারশাস্ত্র) আলোকে লিখা শুরু করেছিলেন। এর প্রথম খণ্ড সূরা বাক্বারায় গিয়ে ঠেকেছিল। এ খণ্ডের শেষে দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কথা বলেছিলেন। কিন্তু লেখা হয়নি। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৩৪ সাল (১৩৫৩ হিঃ)। তিনি ১৮৬৮ সালে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ সারগোধাতে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী :

অবিভক্ত পাঞ্জাবে উর্দূ ভাষায় পুরা কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখক দ্বিতীয় আহলেহাদীছ আলেম হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী। তাঁর তাফসীরের নাম 'সিরাজুল বায়ান' (سراج البيان)। এই তাফসীরটি প্রথমবার ১৯৩৪ সালে মুদ্রিত হয়। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকে এটি খুবই সুন্দর তাফসীর।

মাওলানা হানীফ নাদভীর কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ১৯২৫-১৯৩০ সাল পর্যন্ত দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌতে জ্ঞানার্জন করা অবস্থায় তিনি কুরআনের বিভিন্ন তাফসীর সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে 'তাখাছ্ছুছ' সনদ লাভ করেন। তিনি ১৯০৮ সালের ১০শে জুন গুজরানওয়ালাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৭ সালের ১২ই জুলাই লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

---

১৪. এই তাফসীরটি প্রকাশিত হওয়ার পর মিসরের 'আল-আহরাম' ও 'আল-মানার' পত্রিকা দু'টি অমৃতসরীকে ভারতের একজন অন্যতম বড় ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া শিবলী একাডেমী (আযমগড়, ইউপি) থেকে প্রকাশিত 'মা'আরিফ' (উর্দূ) পত্রিকা এটিকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৪১-৪২)*।-অনুবাদক।

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী :

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী প্রথম লেখক, যিনি উর্দূ ভাষায় ‘জামউল কুরআন ওয়াল হাদীছ’ (جمع القرآن والحديث) নামে গ্রন্থ লিখেন এবং প্রমাণ করেন যে, বর্তমানে যেই ধারাবাহিকতায় কুরআন মাজীদ মওজুদ রয়েছে এবং যেভাবে মানুষ তেলাওয়াত করে, ঠিক সেই ধারাবাহিকতায়-ই নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজীদ সংকলিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর বরকতময় যুগে হাদীছের সংগ্রহ ও সংকলনের সূচনাও ছাহাবীগণ করেছিলেন এবং অসংখ্য হাদীছ সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রন্থটি প্রথমবার আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ, মসজিদে মুবারক, লাহোর প্রকাশ করেছিল। তিনি ১৩০৭ হিজরীর ১লা শাওয়ালে (২১শে মে ১৮৯০ খ্রিঃ) বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৬৯ হিজরীর ৩রা ছফরে (২৫শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ :

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপমহাদেশের এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের জ্ঞানগত মর্যাদা ও বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে গোটা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কুরআন মাজীদের মাধ্যমেই তিনি নিয়ম মাফিক লেখনী ও বক্তব্যের সূচনা করেছিলেন। এই হেদায়াতের গ্রন্থের সাথে তাঁর সীমাহীন আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। ‘তারজুমানুল কুরআন’ (ترجمان القرآن) নামে তিনি অনুবাদ ও তাফসীর শুরু করেছিলেন। এই তাফসীরটি সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নূরের শেষ পর্যন্ত চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫] দুঃখের

---

১৫. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সর্বপ্রথম ‘বুরহান ওয়া বাছায়ির’ নামে কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সিআইডি তাঁর কাগজপত্র তল্লাশি করার সময় ঐ তাফসীরের পাণ্ডুলিপিও নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি এর একটি পৃষ্ঠাও পাননি। এরপর তিনি ‘তারজুমানুল কুরআন’ লেখা শুরু করেন। যার অধিকাংশ রাঁচী ও মীরাঠের সেন্ট্রাল জেলে লিখেন। মাওলানার ভাষ্য অনুযায়ী ২৭ বছরের অধিক সময় ব্যাপী তিনি ‘তারজুমানুল কুরআন’ লিপিবদ্ধ করেন *(দ্র. মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী, সীরাতে আযাদ (লাহোর : মুসলিম পাবলিকেশন্স, তা.বি), পৃঃ ৬৪)*। ‘ছাকাফাতুল হিন্দ’ পত্রিকায় মাওলানার এই তাফসীরের আরবী অনুবাদ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে ড. সাইয়িদ আব্দুল খতীফ হায়দারাবাদী এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিক গোলাম রসূল মেহের মাওলানার প্রবন্ধ ও

বিষয় বাকী পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়ে গেছে। তাঁর এই তাফসীরের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা, সূরা ইউসুফ ও সূরা কাহফের তাফসীর বেশ বিস্তারিত এবং তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে জবরদস্ত তাফসীর। যা পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থকারেও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু উর্দূ ভাষাতেই নয় বরং কোন ভাষাতেই এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী তাফসীর লিখা হয়নি।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উপমহাদেশের প্রথম আলেম, যিনি কুরআন মাজীদের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি 'আমছালুল কুরআন' (কুরআনের উপমাসমূহ) নামেও একটি গ্রন্থ লিখেছেন। উপরন্তু কুরআনের আলোকে তিনি আল-কালিমুত তাইয়িব, আদ-দ্বীনুল খালেছ, আল-বুরহান, কানূনে নশব ওয়া ইরতিকা (বিবর্তনবাদ তত্ত্ব), হাকীকাতে ঈমান, কুফর ওয়া নিফাক, খাছায়িছে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলো স্ব স্ব বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কুরআন মাজীদের আলোকে তাঁর সকল দাওয়াতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। উপমহাদেশের আলেমগণ তাঁকে 'ভারতবর্ষের ইবনে তাইমিয়া' বলে অভিহিত করতেন। কালের এই অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ১৩০৫ হিজরীর ১লা যুলহিজ্জাহ (৯ই আগস্ট ১৮৮৮) মক্কা মুকাররমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৩৭৭ হিজরীর ২রা শা'বান) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।

উর্দূ পদ্যে কুরআনের অনুবাদ :

আব্দুল আযীয খালেদ আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দখল রাখতেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কবি ছিলেন। তিনি ৩৩টি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন, যার মধ্যে ৩টি গ্রন্থ গদ্যে এবং ৩০টি তাঁর কাব্য সংকলন। তাঁকে পাকিস্তানের বড় সরকারী অফিসারদের মধ্যে গণ্য করা হত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদের উর্দূ পদ্যানুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ পণ্ডিত মহলে সাদরে গৃহীত হয়। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ

গ্রন্থাবলীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কতিপয় আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর 'বাকিয়াতে তারজুমানুল কুরআন' নামে প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'আল-কাওলুন মাতীন ফী তাফসীরে সূরা ওয়াত-তীন' নামে তিনি সূরা তীনের তাফসীর লিখেন। যেটি ১৩৪০ হিজরীতে লাহোরের কারীমী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *(দ্র. জুহূদু আহলিল হাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ৫৩-৫৪)*।- অনুবাদক।

নাদভীর দারুণ ভক্ত ছিলেন এবং উলূমে কুরআনে তাঁকে (নাদভী) নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মনে করতেন। আব্দুল আযীয খালেদ ১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৩৪৫ হিজরীর ১০শে রজব) জলন্ধর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) 'পরজিয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারী (১২ই ছফর ১৪৩১) লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী ও পশতু অনুবাদ :

কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদের আলোচনায় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর পরে হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর ফার্সী অনুবাদ এবং তাঁর পাঞ্জাবী পদ্যে লিখিত 'তাফসীরে মুহাম্মাদী' ও পাঞ্জাবী অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কুরআনের আরেকটি পাঞ্জাবী অনুবাদ সম্পর্কে শুনুন! এই অনুবাদটি খ্যাতিমান আলেম মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ নওশাহরাবীর। তিনি শিয়ালকোট যেলার 'নওশাহরাহ কাকে যিয়া' গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং কাকেযী বংশের লোক ছিলেন। নিজ গ্রামের কতিপয় শিক্ষকের নিকট কিছু কিতাব পড়ার পর শিয়ালকোটে আসেন এবং সেখানকার আলেমদের কাছ থেকে উপকৃত হন। এরপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লাহোর যাত্রা করেন এবং এই শহরের আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছুদিন পর লাহোর থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লী পৌঁছেন এবং সেখানে মিয়াঁ নাযীর হুসাইনের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। দিল্লীতে হেকিমি বিদ্যাও পড়েন। দীর্ঘ সময় তিনি এখানে কাটান। দিল্লী থেকে প্রস্থান করে অমৃতসরে আসেন এবং সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালের পর (১২৯৯ হিঃ) নিজ গ্রাম 'নওশাহরাহ কাকে যিয়া'তে আসেন। সেখানে অল্প কিছুদিন অবস্থান করে রাওয়ালপিণ্ডিতে চলে যান এবং সেখানে হেকিমি চিকিৎসা শুরু করেন। রাওয়ালপিণ্ডির আহলেহাদীছ মসজিদে ইমামতি ও খতীবের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং পাঞ্জাবীতে সূরা ফাতিহার তাফসীর লিখেন। ১৯১১ সালে (১৩২৯ হিঃ) কোন কাজের সূত্রে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শিয়ালকোটে আসেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৃতীয় দিন শিয়ালকোটে তাঁর মৃত্যু হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী তাঁকে গোসল দেন এবং জানাযার ছালাত পড়ান। সেখানে মঙ্গা শাহের কবরস্থানে ঈদগাহের দেয়ালের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

আমার জানা মতে খাঁটি পাঞ্জাবী ভাষায় কুরআন মাজীদের দু'টি অনুবাদ হয়েছে, যা আহলেহাদীছ আলেমগণ করেছেন। একটি অনুবাদ করেছেন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী (মৃঃ ছফর ১৩৩১ হিঃ/সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রিঃ) এবং অন্যটি করেছেন মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ নওশাহরাবী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ/১৯১১ খ্রিঃ)।

মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানীকে উপমহাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি নিজ শহর মুলতানে 'মাকতাবা সালাফিয়া' নামে গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের সিলসিলা শুরু করেছিলেন এবং মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেন। তিনিই প্রথম আলেম যিনি সারায়েকী (বা মুলতানী) ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং টীকা লিখেন। এর সাথে শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীর উর্দূ অনুবাদ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই অনুবাদটি হারিয়ে গেছে। শুধু ১ম ও ত্রিশ পারার অনুবাদ সংরক্ষিত ছিল, যা প্রকাশ করা হয়েছে। মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্রত্ব গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৮৭১ সালের ৩১শে আগস্ট (১২৮৮ হিজরীর ১৪ই জুমাদাল আখেরাহ) মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৯শে মে (১৩৬৬ হিজরীর ৯ই রজব) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান হাফীয ভাওয়ালপুরের রিয়াসাতী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন। ১৩৭২ হিজরীতে (১৯৫৩ খ্রিঃ) ভাওয়ালপুরের আযীযুল মাতাবে প্রেস থেকে যেটি প্রকাশিত হয়। এই ভাষাটি মুলতানী ভাষার সাথে মিলে যায়। মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান হাফীযের জীবনী আমি জানতে পারিনি। রিয়াসাতী ভাষায় অনূদিত কুরআন মাওলানা আবু হামযা আব্দুল হামীদ সালাফী (মুসলিম কলোনী, রোড নং ২, খায়েরপুর সাদাত, আলীপুর, যেলা মুযাফ্ফরগড়) আমাকে প্রদান করেছেন। এজন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞভাজন।

মাওলানা আব্দুল গাফফার যামেরানী ছিলেন প্রথম আলেম যিনি বালুচী ভাষায় কুরআন অনুবাদের সূচনা করেছিলেন। এই সিলসিলা ২৫ পারা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকার পর তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয় এবং করাচীর এক হাসপাতালে তিনি

মৃত্যুবরণ করেন। মাওলানা বেলুচিস্তান প্রদেশের মুকরান এলাকার এক পাহাড়ী স্থান 'যামেরানে' ১৯৩৪ সালে (১৩৫২ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালের ৩১শে মে (১৪২৫ হিজরীর ১১ই রবীউছ ছানী) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম রুস্তমী ১৩৫৯ হিজরীর রামাযান মাসে (নভেম্বর ১৯৪০) সারহাদ প্রদেশের মারদান যেলার রুস্তম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে দেওবন্দী হানাফী ছিলেন এবং হানাফী মাদরাসাগুলিতে জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর আহলেহাদীছ হন এবং দরস-তাদরীস ও লেখনীতে সীমাহীন খিদমত আঞ্জাম দেন। পশতু ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন এবং তাফসীরও লিখেন। যেটি ১৬৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী। এর নাম 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম' (تفسير القرآن الكريم)। মাওলানা আব্দুল মালেক মুজাহিদ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম' এই তাফসীরটি প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছে। উন্নত কাগজ, চমৎকার ছাপা এবং দৃষ্টিনন্দন বাঁধাইয়ের পশতু ভাষার এই অনুবাদ ও তাফসীর এক চমৎকার উপহার। যা প্রথমবারের মতো কুরআন প্রেমিকরা লাভ করেছে। দো'আ রইল আল্লাহ যেন তাকে (আব্দুল মালেক) দ্বীনের বেশী বেশী খিদমত করার তৌফিক দেন।

পাকিস্তানী আলেম মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ সিন্ধু প্রদেশের তহসিল বাদীনের কুণ্ডী নামক গ্রামে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৪ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্র বংশের সন্তান ছিলেন। ধীরে ধীরে জ্ঞানার্জন করেন। রাজনীতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে তিনি খেলাফত আন্দোলন সহ অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্দী হন। ১৯৩২ সালে তিনি আহলেহাদীছ হন। অতঃপর আল্লাহ তৌফিক দিলে সিন্ধী পদ্যে কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন। এর পূর্বে সিন্ধী পদ্যে কুরআনের অনুবাদের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সিন্ধী ভাষার এই পদ্যানুবাদ ১৩ বছরে সমাপ্ত হয়। তিনি এর নাম রাখেন 'নূরুল কুরআন মানযূম তারজামাতুল কুরআন' (نور القرآن منظوم ترجمة القرآن)। ১৪১৫ হিজরীতে (১৯৯৪ খ্রিঃ) এই অনুবাদটি সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ্র সময়ে সিন্ধুতে একটি বড় ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। বাদীনের নিকটবর্তী স্থানে 'লাওয়ারী' নামে একটি খানকা আছে। যেখানে প্রথম দিকে ওরস ও মেলা বসত। কিন্তু ১৯৩৮ সালে যথারীতি ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ৯ই যিলহজ্জ লাওয়ারীতে গরীবদের জন্য হজ্জের খুৎবা পড়া হবে। তাছাড়া প্রচার করা হয় যে, যে ব্যক্তি হজ্জের দিনগুলোতে হজ্জের নিয়তে লাওয়ারী দরগায় উপস্থিত হবে, সে আল্লাহ্র নিকট হাজী ও মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। দরগার বাইরে একটি সাইনবোর্ডে এই কথাগুলো লেখা হয়েছিল- 'হাজী, নাজী, গাযীকে শত শত মুবারক ও সালাম। ৩-টার সময় হজ্জের খুৎবা প্রদান করা হবে'। এমনকি লাওয়ারীর মাটিকে মক্কা-মদীনার সাথে তুলনা করা হয় *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যমযমের পানি, আরাফাত এবং বাকী কবরস্থানের নামও নির্বাচন করা হয়।

এই মুশরিকী ও ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা শুনে শুধু সিন্ধু প্রদেশই নয় বরং যেখানে যেখানে এই প্রাণঘাতী খবর পৌঁছেছিল, সেখান থেকে তাওহীদপন্থীদের কাফেলা একের পর এক বাদীনে পৌঁছতে শুরু করে। তাদের মধ্যে আফগানী, সিন্ধী, বালুচী, পাঞ্জাবী সবাই ছিল। ঐ তাওহীদী কাফেলার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ। তিনি সেখানে পৌঁছা মাত্রই ঘোষণা করেন, হজ্জের জন্য আল্লাহ শুধুমাত্র মক্কা মুকাররমাকে নির্বাচন করেছেন। আমরা মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু লাওয়ারী বা অন্য কোন জায়গায় তোমরা যা করতে চাচ্ছ তা করতে দিব না। ইংরেজ শাসনের সময় ছিল। মাওলানাকে গ্রেফতার করা হল। জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করল। অবশেষে মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ সফলকাম হলেন এবং লাওয়ারীতে হজ্জ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ব্যর্থ-মনোরথ হল। বৃটিশ সরকারও অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিল। এটি ছিল অনেক বড় ফিতনা, যা ১৯৩৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে এবং মাওলানা আহমাদ মাল্লাহ্র দুঃসাহসী আন্দোলনের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ১০০ বছর বয়স পেয়ে ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুলাই (১৩৮৮ হিজরীর ২২শে রবীউল আখের) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ বাদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধু প্রদেশের অনেক বড় আলেম পরিবারের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তিনি আরবী, উর্দূ ও সিন্ধীতে ১০৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি স্বীয় যুগের অনেক বড় বক্তাও ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কুরআন-হাদীছের সকল দিক ও

বিভাগে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি উপমহাদেশের একমাত্র আলেম, যিনি সিন্ধী ভাষায় 'বাদীউত তাফাসীর' (بديع التفاسير) নামে কুরআন মাজীদের তাফসীর লিখেছেন। যেটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। সিন্ধু এলাকায় এই তাফসীরটি অপরিসীম গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তিনি ১৯২৫ সালের ১০শে জুলাই (১৯শে যিলহজ্জ ১৩৪৩ হিঃ) ঝাণ্ডাপীর গ্রামে (যেলা হায়দারাবাদ, সিন্ধু) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ৮ই জানুয়ারী (১৬ই শা'বান ১৪১৪ হিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর :

এখন বাংলা ভাষার অনুবাদ ও তাফসীর সম্পর্কে শুনুন! বাংলা ভাষায় অনেক আলেম কুরআন মাজীদ সম্পর্কে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এর কিছু সূরার অনুবাদ করেছেন ও তাফসীর লিখেছেন। সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্বাস আলী। তিনি ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল মুনশী তমীযুদ্দীন। তিনি চণ্ডীপুর, বশীরহাট, চব্বিশ পরগনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালের অক্টোবরে প্রথমত কুরআন মাজীদের শেষ পারার অনুবাদ করে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। যা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এর দুই মাস পর ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত অনুবাদের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এটাও লোকেরা খুব আগ্রহভরে ক্রয় করে এবং পড়ে। এরপর ১৯০৯ সালে তিনি পুরা কুরআন মাজীদের টীকাসহ অনুবাদ আলতাফী প্রেস, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি ৯৬৭ পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত ছিল। কুরআন মাজীদের আয়াতের সাথে প্রথমে ছিল শাহ রফীউদ্দীন দেহলভীর উর্দূ অনুবাদ, তারপর আব্বাস আলীর বাংলা অনুবাদ। বাংলা ও উর্দূ ভাষায় সংক্ষিপ্ত তাফসীরও ছিল। এই অনুবাদটি বঙ্গদেশে খুবই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে এবং বহুলভাবে পঠিত হয়। অল্পদিনের ব্যবধানে এটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর কলকাতা থেকে একাধিকবার ছাপানো হয়। তিনি ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলার প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালান এবং অবস্থাভেদে স্বীয় যুগের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, অল ইন্ডিয়া খেলাফত মজলিস,

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং এগুলোর প্লাটফর্মে সোৎসাহে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য কয়েক বছর জেলে ছিলেন। সাংবাদিকতার ময়দানেও দারুণ সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলা ভাষায় তিনটি পত্রিকা চালু করেন। সেগুলো ছিল ১. সেবক ২. যামানা[১৬] ও ৩. দৈনিক আজাদ। বাংলা ভাষায় তাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' নামেও একটি পত্রিকা ছিল। এ সকল পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আব্দুল বারী। পিতা-পুত্র দু'জনই মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জেলে থাকাবস্থায় কুরআন মাজীদের বঙ্গানুবাদ করেন।[১৭] তিনি ১৮৬৭ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং একশ বছরের কাছাকাছি বয়স পেয়ে ১৯৬৮ সালের ১৮ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

উপমহাদেশে কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ :

ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কেও পড়ুন! ১৯০৫ সালে ড. আব্দুল হাকীম খান প্রথম কুরআন মাজীদের ইংরেজী অনুবাদ করেন। যিনি বর্তমান পূর্ব পাঞ্জাবের পাটিয়ালা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কিছুকাল কাদিয়ানীদের সাথে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে কাদিয়ানী মতবাদ থেকে তওবা করেন। ইংরেজী ছাড়া তিনি কুরআনের উর্দূ অনুবাদও করেছিলেন। ড. আব্দুল হাকীম খানের ইংরেজী অনুবাদের পূর্বে ইউরোপীয় ভাষায় অমুসলিমরাই কুরআন মাজীদের অনুবাদ করত। অনুবাদের বিশুদ্ধতার কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না।[১৮] তিনি ১৩৫৯ হিজরীতে (১৯৪০ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

---

১৬. এটি ছিল উর্দূ দৈনিক, বাংলা নয়।-অনুবাদক।।

১৭. মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'সেবক' পত্রিকায় ১৯২১ সালে 'অগ্রসর! অগ্রসর!!' শিরোনামে একটি জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ১ বছর বন্দী করে রাখে। এ সময় তিনি কুরআন মাজীদের ৩০তম পারার বঙ্গানুবাদ ও তাফসীর করেন। ১৯২২ সাথে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় *(দ্র. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৯), পৃঃ ১১১, ১১৩; আবু জাফর সম্পাদিত, মাওলানা আকরম খাঁ (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ১০০৭, পৃঃ ১৬৯)*। তাছাড়া তিনি ৬ খণ্ডে 'তাফসীরুল কোরআন' নামে বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর লিখেছেন। -অনুবাদক।

১৮. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা, পৃঃ ১৩।

কুরআন মাজীদের একটি ইংরেজী অনুবাদ মির্যা হায়রাত দেহলভী করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মাদ উমরাও বেগ। মির্যা হায়রাত দেহলভী নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক ছিলেন। ১৮৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৮ সালে (১৩৪৬ হিঃ) সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। উপমহাদেশে কুরআনের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করার মর্যাদাও আহলেহাদীছগণ লাভ করেন।

২য় অধ্যায়

হাদীছ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীরে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকার কথা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন হাদীছে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকার কথা আলোচনা করছি। তবে তার পূর্বে কিছু যরূরী কথা লক্ষণীয়।

উপমহাদেশের অগণিত আলেম সবিশেষ গুরুত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের খিদমত করেছেন এবং করছেন। কেউ দরস-তাদরীসের (পঠন-পাঠন) মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের দৃঢ় সংকল্প করেছেন। কেউ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। কেউ কোন গ্রন্থের উর্দূ বা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ করা আবশ্যক মনে করেছেন। কেউ হাদীছের তাখরীজকে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেছেন এবং কেউ হাদীছের প্রকার সমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীছের খিদমতের এ পদ্ধতি সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বিশেষত আহলেহাদীছ আলেমগণ এই মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং তাদের প্রচেষ্টার বদৌলতে হাদীছের জ্ঞান সমূহের প্রচার-প্রসারের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, এ ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার কারণে এটি একটি বিশাল বড় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। শায়খ মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী যাকে ‘একটি বড় পুনর্জাগরণ’ (نهضة عظيمة) বলে বর্ণনা করছেন। আর এর বর্ণনা দিতে গিয়ে হিজরী চতুর্দশ শতকের মিসরের খ্যাতিমান গ্রন্থকার ও মুহাক্কিক আল্লামা রশীদ রিযা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন-

لولا عناية إخواننا علماء الهند فى هذا العصر لقضى عليها بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعف فى مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف فى أوائل هذا القرن الرابع عشر.

‘যদি এই যুগে আমাদের ভারতীয় ভাইগণ হাদীছের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিতেন, তাহলে প্রাচ্যের দেশগুলো থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যেত। কারণ হিজরী

দশম শতক থেকেই মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হিজাযে এর চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল এবং চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে তা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল'।[১৯]

সত্যের স্বীকৃতি :

উপমহাদেশের আলেমগণ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের জন্য যে সীমাহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আল্লামা রশীদ রিযা ছাড়াও আরব বিশ্বের আরো অনেক মুহাক্কিক আলেম তার বর্ণনা দিয়েছেন। খোদ ভারতের প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, এই বিষয়ে মৌলিক কাজ আহলেহাদীছ আলেমগণই করেছেন। মাওলানা বলছেন, 'এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, দ্বীনের মৌলিক উৎস সমূহের (কুরআন ও হাদীছ) দিকে ভারতীয় হানাফী মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনে আহলেহাদীছ ও গায়ের মুক্বাল্লিদদের আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। সাধারণ জনগণ গায়ের মুক্বাল্লিদ হয়নি বটে, তবে গোঁড়া তাক্বলীদ ও অন্ধ অনুকরণের ভেল্কিবাজি অবশ্যই ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে'।[২০]

হানাফী জামা'আতেরই একজন বুযুর্গ মাওলানা সাইয়িদ রশীদ আহমাদ আরশাদের 'হিন্দ ও পাকিস্তান মেঁ ইলমে হাদীছ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মাসিক 'আল-বালাগ' পত্রিকায় (করাচী) প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'শেষ যামানায় হাদীছের পাঠদান ও প্রচার-প্রসারের ফলে ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ নামে একটি ফের্কা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যারা ইমামদের তাক্বলীদ করার বিরোধিতা করত। এর ফলে হানাফী আলেমদের মধ্যেও হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তারা ফিক্বহী মাসআলাগুলোকে হাদীছের আলোকে প্রমাণ করার প্রতি মনোযোগী হয়। এভাবে এই ফের্কার অস্তিত্ব ইলমে হাদীছের অগ্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[২১]

এই লাইনগুলোতে প্রবন্ধকার মাযহাবী গোঁড়ামিবশত আহলেহাদীছগণের বিরুদ্ধে বিষোদগারের যে বিষাক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাতো

---

১৯. মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ-এর ভূমিকা *(লাহোর : সুহাইল একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৭ খ্রিঃ)*।
২০. মাসিক 'বুরহান', দিল্লী, আগস্ট ১৯৮৫।
২১. মাসিক 'আল-বালাগ', করাচী, যিলহজ্জ ১৩৮৭ হিঃ।

একেবারেই সুস্পষ্ট। আমরা এখন এর প্রতিবাদ করতে চাচ্ছি না। এখানে শুধু এটা পেশ করা উদ্দেশ্য যে, আহলেহাদীছগণের কঠিন বিরোধিতাকারীও এই সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণই নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রকৃত মুবাল্লিগ। হানাফীরা আহলেহাদীছগণকে দেখে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয় এবং এটাও স্রেফ কাটছাঁট করে হাদীছ থেকে নিজেদের কতিপয় ফিক্বহী মাসআলা প্রমাণ করার জন্য। মাশাআল্লাহ তারা এই কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আহলেহাদীছ কোন ফের্কা নয় :

ঘটনাসমূহের আলোকে যদি দেখা যায় তাহলে আহলেহাদীছ ভারতবর্ষে সৃষ্ট কোন ফের্কা নয়। বরং ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে অবগত করে যে, এই ভূখণ্ডের লোকজন হিজরী প্রথম শতকেই ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশ সমূহের সংবাদ পেতে শুরু করেছিল। কারণ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কল্যাণকর যুগে (১৫ হিঃ) এই ভূখণ্ডে ছাহাবায়ে কেরামের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের শুভাগমনও এখানে হয়েছিল। এই পুণ্যবান জামা'আতের মর্যাদাবান সদস্যগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা এখানে যার তাবলীগ করেন এবং এই ভূখণ্ডের বাসিন্দারা সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বহু জায়গায় 'ক্বালাল্লাহ' ও 'ক্বালার রাসূল' (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছ)-এর মর্মস্পর্শী ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় ঐ সময় জনবসতি এত নিকটে ছিল না এবং মানুষজনের মধ্যে যোগাযোগও ছিল না। মনুষ্যবসতির পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ এবং লোকজন পরস্পর থেকে দূর-দূরান্তে বসবাস করত। লেখালেখির কোন উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ছিল না এবং সেই সময় এই অঞ্চল সমূহে গ্রন্থ রচনারও কোন প্রচলন ছিল না। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং কোথাও ছাপাখানার চিহ্ন পাওয়া যেত না। লেখাপড়া এবং হাদীছের পঠন-পাঠনের পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। তবে যতটুকু ছিল তা ছিল প্রভাব বিস্তারকারী এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

হাদীছ প্রসারের ঢেউ :

হিজরী তের ও চৌদ্দ শতকে সারা পৃথিবীতে উন্নতি-অগ্রগতির ঢেউ উঠে এবং শিক্ষার প্রচলনও ব্যাপক হয়। বিপুলসংখ্যক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, গ্রন্থ রচনার জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়, প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থসমূহের প্রকাশনাও ব্যাপক হওয়া শুরু করে। উপমহাদেশের মানুষদের উপরও এর প্রভাব পড়ে এবং নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তারা কাজে নিমগ্ন হয়। এই সময়ে (হিজরী দ্বাদশ শতক) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর প্রচার ও লেখনীর মহোদ্যম প্রসিদ্ধি লাভ করে। অতঃপর তাঁর সম্মানিত পুত্রগণ (শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ, শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আব্দুল কাদের) ও এঁদের ছাত্রদের পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার খিদমতের এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ, মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান, মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানবী আযীমাবাদী, মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম আরাভী, হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী, সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী, মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী এবং অন্যান্য অসংখ্য উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম এই সোনালী-পরম্পরার উজ্জ্বল মুক্তাদানায় পরিণত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন! ভূমিকামূলক এসব কথার পর সামনে চলুন!

ইলমে হাদীছে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর অবদান :

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী কুরআন সম্পর্কে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অবগত হয়েছেন। অবস্থানুযায়ী স্বীয় যুগে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছেরও তিনি সীমাহীন খিদমত করেছেন। হিজাযের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান সমূহে গভীর পাণ্ডিত্য হাছিল করেন। এরপর ভারতে ফিরে এসে এই মৌলিক জ্ঞানকে অধিকতর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। ইতিপূর্বে উপমহাদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত ইলমে হাদীছের খুব একটা বেশী প্রচলন ছিল না। এজন্য তিনি এই জ্ঞানের (হাদীছ) প্রচার-প্রসারকে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এর জন্য তিনি পাঠদান ও গ্রন্থ রচনা উভয় খিদমতই আঞ্জাম দেন।

লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হল তিনি মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের দু'টি শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এটি হাদীছের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। এর বিন্যাস ও রচনাশৈলী দ্বারা শাহ ছাহেব খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তিনি এটিকে হাদীছের মূল ও ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করতেন। এজন্য তিনি 'আল-মুছাফফা' (المصفّى) নামে এর আরবী শরাহ লেখেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে ফার্সী ভাষার প্রচলন বেশী থাকায় তিনি ফার্সীতেও এর একটি শরাহ লিখেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল-মুসাওয়া' (المسوّى)। তাছাড়া ছহীহ বুখারীর অধ্যায় শিরোনামের ব্যাখ্যা সম্বলিত 'শারহু তারাজুমি আবওয়াবি ছহীহিল বুখারী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' লিপিবদ্ধ করেন। যেটি শরী'আতের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ইসলামী বিধি-বিধান সমূহের দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বৃহদাংশ বিষয় হাদীছের উপর ভিত্তিশীল। এটি অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, শাহ ছাহেব ইলমে হাদীছে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি উপমহাদেশে ইলমে হাদীছের এমন খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, ইতিপূর্বে এই ভূখণ্ডের কোন আলেমের কল্পনাতেও কখনো যা আসেনি।

লেখনী ছাড়া এই ভূখণ্ডে শাহ ছাহেব পাঠদানেরও এক ব্যাপক সিলসিলা জারি করেছিলেন। অসংখ্য জ্ঞানান্বেষী তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে। অতঃপর এই পরম্পরা সামনে এগুতে থাকে এবং এখনও এগুচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এগুতে থাকবে। এর প্রভাব উপমহাদেশের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য দেশসমূহেও গিয়ে পৌঁছে। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মানুষ এখানে আসে এবং এই দেশের বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীছ পড়ে।

শাহ ছাহেবের সম্মানিত পুত্রগণ :

শাহ অলিউল্লাহ্র পরে তাঁর সম্মানিত পুত্রগণও পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইলমে হাদীছের প্রসারের জন্য সীমাহীন প্রচেষ্টা চালান। শাহ আব্দুল আযীয ফার্সী ভাষায় 'বুসতানুল মুহাদ্দিছীন' নামে মুহাদ্দিছগণের জীবনী সম্বলিত একটি গ্রন্থ লিখেন। এর পূর্বে এই বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন ভাষাতেই কোন গ্রন্থ ছিল না। তিনি আরো অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই চার

ভাই (শাহ আব্দুল আযীয, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ আব্দুল গণী) পাঠদানের মাধ্যমেও লোকজনের অনেক উপকার সাধন করেছেন।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের কুরআনী খিদমত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীছ সম্পর্কে আরবী, ফার্সী, উর্দূ তিন ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে আরবীতে তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ হ'ল:-

১. আওনুল বারী লিহাল্লি আদিল্লাতিল বুখারী ২. আস-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ফী কাশফি মাতালিবি মুসলিম বিন হাজ্জাজ ৩. ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলূগুল মারাম ৪. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ ৫. আর-রাওযুল বাসসাম মিন তারজামাতি বুলূগুল মারাম ও মুওয়াল্লিফিহিল ইমাম ৬. নুযুলুল আবরার বিল ইলমিল মা'ছূর ফিল আদ'ইয়্যাহ ওয়াল আযকার ৭. আর-রহমাতুল মুহদাত ইলা মাইঁ য়ুরীদু যিয়াদাতাল ইলম আলা আহাদীছিল মিশকাত ৮. আল-ইবরাতু বিমা জাআ ফিল গাযবি ওয়াশ শাহাদাতি ওয়াল হিজরাহ। এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরবীতে এ বিষয়ে তাঁর রচনাবলী রয়েছে।

ফার্সীতে নওয়াব ছাহেবের হাদীছ সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থ হ'ল : ১. সিলসিলাতুল আসজাদ ফী মাশায়িখিস সিন্দ ২. মিসকুল খিতাম শারহু বুলূগুল মারাম ৩. মানহাজুল উছূল ইলা ইছতিলাহি আহাদীছির রাসূল ৪. মাওয়াইদুল আওয়াইদ মিন উয়ূনিল আখবার ওয়াল ফাওয়াইদ।

এখন হাদীছ সম্পর্কে উর্দূতে রচিত নওয়াব ছাহেবের কতিপয় গ্রন্থের নাম পড়ুন! ১. বুগয়াতুল কারী ফী তারজামাতি ছুলাছিয়্যাতিল বুখারী ২. ইত্তিবাউল হাসানাহ ফী জুমলাতি আইয়্যামিস সানাহ ৩. তামীমাতুছ ছাবী ফী তারজামাতি আহাদীছিন নবী ৪. তাওফীকুল বারী লিতারজামাতিল আদাব আল-মুফরাদ লিল-বুখারী ৫. গুনইয়াতুল কারী ফী তারজামাতি ছুলাছিয়্যাতিল বুখারী ৬. মাহাসিনুল আ'মাল ৭. যূউশ শামস ফী শারহি হাদীছি বুনিয়াল ইসলামু আলা খামস। উর্দূতে হাদীছ বিষয়ে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক গুণে গুণান্বিত করেছিলেন।

হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবী লিখিত হাশিয়া সমূহ :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীকৃত কুরআনের ফার্সী ও পাঞ্জাবী অনুবাদ এবং 'তাফসীরে মুহাম্মাদী'র বর্ণনা এসে গেছে। হাফেয ছাহেব আরবীতে সুনানে আবুদাঊদ ও মিশকাতের হাশিয়া লিখেছেন। তিনিই ছিলেন প্রথম পাঞ্জাবী আলেম, যিনি আরবীতে এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী যখন আবুদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ' লিখছিলেন, তখন তিনি হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীকৃত আবুদাঊদের হাশিয়া দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। এর অর্থ হল তিনি মাওলানা আযীমাবাদীর পূর্বে এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ১২৭১ হিজরীতে তিনি আবুদাঊদের হাশিয়া লিখেন এবং ১২৭২ হিজরীতে তা মুদ্রিত হয়। মিশকাতের হাশিয়া লিখেন ১২৭২ হিজরীতে, যা ঐ বছরই প্রকাশিত হয়। এর মানে হল উপমহাদেশের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে হাফেয ছাহেবের গবেষণাপূর্ণ লেখনীগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হত।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনায় গযনভী আলেমদের অবদান :

সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী[২২] উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ১২৩০ হিজরীতে (১৮১৫ খ্রিঃ) আফগানিস্তানের গযনী যেলার 'বাহাদুর খায়ল' দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় যুগের খ্যাতনামা আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। দিল্লী গিয়ে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে ছহীহ বুখারী পড়েন। অত্যন্ত মুত্তাক্বী আলেম এবং নিজ জন্মভূমি আফগানিস্তানে তাওহীদ ও সুন্নাতের অনেক বড় মুবাল্লিগ ছিলেন। বিদ'আত ও শিরকী রসম-রেওয়াজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আফগানিস্তানের দুষ্ট আলেমগণ এই মৌলিক বিষয়ে তাঁর কঠিন বিরোধিতা করে এবং তদানীন্তন সরকারকে বলে যে, এই ব্যক্তি দেশে ফিতনা ছড়াচ্ছে। এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হোক। সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে কঠিনভাবে প্রহার করে এবং তিনপুত্র মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল্লাহ ও মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী সহ তাঁকে জেলখানায় বন্দী করে।[২৩]

---

২২. মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৪, পৃঃ ৬৩-৬৬।-অনুবাদক।

২৩. সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর এক ছেলের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সরকার তাকেও পিতার সাথে বন্দী করেছিল।

অত্যন্ত কঠিন শাস্তি প্রদানের পর আফগানিস্তান সরকার সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। দেশ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর এই পুণ্যবান লোকগুলো বিভিন্ন স্থান ঘুরেফিরে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে পৌঁছেন এবং সেখানে তাঁরা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি 'মাদরাসা গযনভিয়াহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন এবং পুরনো গ্রন্থগুলো প্রকাশও করেন। যার মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হাদীছ সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ এঁদেরই প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো প্রকাশনার মুখ দেখে। সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী ১২৯৮ হিজরীর ১৫ই রবীউল আওয়াল (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮১ খ্রিঃ) অমৃতসরে মৃত্যুবরণ করেন।

নিম্নে এই পরিবারের আলেমদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় খিদমতের বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে। যার মধ্যে কুরআনী খিদমতও শামিল রয়েছে। তাঁদের সব খিদমতকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে।

যখন সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভী আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে ভারতে আসেন, তখন তার ১২ পুত্র ও ১৫ কন্যা ছিল। এক ছেলের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। হিজরতের সময় এদের অধিকাংশই তাঁর সহযাত্রী হয়ে এখানে আসে। এখানকার আবহাওয়া কারো কারো অনুকূলে হয়নি বিধায় তারা এদেশে আসার পর খুব বেশী দিন বাঁচেনি। এঁরা সকলেই কুরআন ও হাদীছে অভিজ্ঞ আলেম, মুবাল্লিগ ও শিক্ষক ছিলেন। এঁদের গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনাগত খিদমতের তালিকা নিম্নরূপ:

১. তাফসীরে জামেউল বায়ান মা'আ হাশিয়া জামেউল বায়ান : এটি (জামেউল বায়ান ওরফে তাফসীরে তাবারী) কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ এবং আলেমদের মধ্যে প্রচলিত তাফসীর। মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভী এর হাশিয়া লিখেন। মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভীর হাশিয়া সহ এই তাফসীরটি ১৮৯২ সালে দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই তাফসীরের সাথে নিম্নোক্ত তেরটি গ্রন্থের সারনির্যাস প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয় : ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর ইকলীল ফী ইসতিমবাতিত তানযীল ও মুফহিমাতুল আকরান ফী মুবহামাতিল কুরআন, ইমাম ইবনু

তাইমিয়ার তাফসীর সুরাতুন নূর, ফাওয়াইদ শারীফিয়্যাহ, ফুতয়া ফী মাসআলাতি কালামিল্লাহি তা'আলা, রিসালাহ ফিল কুরআন, কাইদাহ ফিল কুরআন, তাফসীর সম্পর্কিত বিভিন্ন ফায়েদা সংবলিত গ্রন্থ 'ফাওয়াইদ শাত্তা', খাতিমাতুত তাবইল মুশতামালাহ আলাল ফাওয়াইদ আল-মুবহামাহ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কিতাবুর রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ, শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর আল-ফাওযুল কাবীর ফী উছূলিত তাফসীর, আহাদীছুত তাওহীদ ওয়া রাদ্দুশ শিরক ও আসবাবুল ইহতিরায মিনাশ শায়তান।

২. হামায়েলে গযনভিয়াহ : এটা ঐ গযনভী হামায়েল (ছোট কুরআন শরীফ), যার অনুবাদ ও টীকা নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান লিখিত। এটি মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর পৌত্র এবং মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভীর পুত্র মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

৩. হামায়েলে গযনভিয়াহ : এটি ঐ গযনভী হামায়েল, যার অনুবাদ শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী এবং হাশিয়া মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভীকৃত। এটি সর্বপ্রথম মাওলানা আব্দুল গফুর বিন মাওলানা মুহাম্মাদ গযনভী অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন এবং তারপর কয়েকবার প্রকাশিত হয়। কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি দারুণ প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন এটা দুষ্প্রাপ্য।

৪. মুছাফফা মা'আ মুসাওয়া : এই গ্রন্থ দু'টি শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী রচিত মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের দু'টি ভাষ্য। মুসাওয়া ফার্সীতে এবং মুছাফফা আরবীতে রচিত। এই দু'টি শরাহ একসাথে প্রথমবার মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

৫. কাশফুল মুগাত্তা : এটি নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খানকৃত মুওয়াত্ত্বা মালেকের উর্দূ অনুবাদ। প্রথমবারের মতো এটি মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ গযনভী দিল্লীর মুর্তাযাবী প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।

৬. রিয়াযুছ ছালেহীন : সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর ইঙ্গিতে এটি প্রথমবারের মতো লাহোর থেকে প্রকাশিত হয় এবং এর উর্দূ অনুবাদ করেন তাঁর শিষ্য মাওলানা আহমাদুদ্দীন কুমাবী। 'কুম' লুধিয়ানা যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) একটি গ্রাম। এটি রিয়াযুছ ছালেহীনের প্রথম উর্দূ অনুবাদ।

৭. মাশারিকুল আনওয়ার[২৪] **:** এটি ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাগানী লাহোরীকৃত (মৃঃ ৬৫০ হিঃ) হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কোন এক সময় এটি পাঠ্যসূচীভুক্ত ছিল। 'তুহফাতুল আখয়ার'-এর অনুবাদ সহ এটি সর্বপ্রথম গযনভী আলেমগণ প্রকাশ করেন।

৮. ইকাযু হিমামি উলিল আবছার : এই গ্রন্থটি তাক্বলীদের বিরুদ্ধে রচিত। মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর ইঙ্গিতে মিয়াঁ আব্দুল আযীয বারএটল'র পিতা মৌলভী ইলাহী বখশ উকিলের (মৃঃ ১৭ই রামাযান ১৩৩৮ হিঃ/৫ই জুন ১৯২০ খ্রিঃ) অর্থায়নে প্রথমবার লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৯. তরজমা মিশকাতুল মাছাবীহ : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী মিশকাতের উর্দূ অনুবাদ করেন। এটি কয়েকবার প্রকাশিত হয় এবং খুব গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

১০. নুছরাতুল বারী : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী 'নুছরাতুল বারী' নামে হাশিয়া সহ ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ শুরু করেছিলেন। মাত্র ৮ পারা সমাপ্ত হয়েছিল।

১১. ইন'আমুল মুন'ঈম : মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী 'ইন'আমুল মুন'ঈম' নামে ছহীহ মুসলিমের উর্দূ অনুবাদ শুরু করেছিলেন। এর শুধুমাত্র **১** পারা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়েছিল কি-না তা জানা যায়নি।

১২. ইজতিমাউল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ আলা গাযবিল মু'আত্তালাত আল-জাহমিয়্যাহ : এটি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের রচনা। প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৩. রিসালাতুল হাকীকাতি ওয়াল মাজায : এটি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ছোট্ট পুস্তিকা। যেটি প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রকাশ করেন।

---

২৪. ফিকহী বিষয় ভিত্তিক এই হাদীছ গ্রন্থটি ৭ম শতাব্দী হিজরীর মধ্যভাগে দিল্লীতে আসে। মুহাম্মাদ তুগলকের সময়ে (৭২৫-৫২ হিঃ/১৩২৫-৫১ খ্রিঃ) দিল্লীতে এর একটি মাত্র কপি মওজুদ ছিল। সুলতান তার রাজকর্মচারীদের পবিত্র কুরআন ও এই গ্রন্থটি স্পর্শ করে আনুগত্যের শপথ নিতেন। ড. মুহাম্মাদ ইসহাক বলেন, 'তৎকালীন সময়ে ফিকহের জালে আবদ্ধ হিন্দুস্থান ও মধ্য এশিয়ায় এই কিতাবখানিই মাত্র ইলমে হাদীছের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল' *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ২৩১ ও ২২৫)*।-অনুবাদক।

১৪. জালাউল আফহাম ফিছ-ছালাতি ওয়াস সালাম আলা খায়রিল আনাম : এটি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রচিত। মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস বিন মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর প্রচেষ্টায় মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৫. শারহু হাদীছিন নুযূল : এটি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রচিত। মাওলানা আবদুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে এটি প্রথমবার প্রকাশ করেন।

১৬. শারহু খামসীন : ইবনু রজব হাম্বলীর রচনা। মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৭. তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ ফিল আ'মাল আল-ক্বালবিয়্যাহ : ইমাম ইবনু তাইমিয়ার রচনা। মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

১৮. ফাতাওয়া আল-হামাবিয়্যাহ : এটির রচয়িতাও ইমাম ইবনু তাইমিয়া। এটিও প্রথমবার অমৃতসর থেকে মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রকাশ করেন।

১৯. মাজমূ'আতুল বায়ান আল-মুবদী লিশানাআতিল কাওল আল-মুজদী : আল্লামা সুলায়মান বিন সাহমান নাজদী এর রচয়িতা। এটিও মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবারের মতো অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন।

২০. মাজমূ'আতুত তাওহীদ আন-নাজদিয়্যাহ ওয়া মাজমূ'আতুল হাদীছ আন-নাজদিয়্যাহ : এটিও গযনভী আলেমগণ প্রথমবারের মতো দিল্লীর আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।

২১. ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ : এই গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভী প্রথমবার প্রকাশ করেন।

২২. ফাতহুল হামীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ : এই গ্রন্থটি মাওলানা আব্দুল গফুর ও আব্দুল আওয়াল গযনভীর ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো আল-কুরআন ওয়াস সুন্নাহ প্রেস, অমৃতসর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৩. ইছবাতু উলুব্বির রাব্ব ওয়া মুবায়ানাতুহু আনিল খালক : এটি মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভীর আরবী রচনা।

২৪. ইছবাতুল ইলহাম ওয়াল বায়'আহ : এটিও মাওলানা আব্দুল জাব্বার রচিত উর্দূ গ্রন্থ।

২৫. ই'আনাতুল মিল্লাতিল ইসলামিয়্যাহ : কাফেরদের অধীনে চাকুরী করা নাজায়েয সম্পর্কিত মাওলানা আব্দুল জাব্বার গযনভী রচিত উর্দূ পুস্তিকা।

২৬. মা'আরিজুল উছূল বিআন্নাল উছূল ওয়াল ফুরূ বায়নাহার রাসূল : এটি মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী রচিত পুস্তিকা।

২৭. দারেমীর হাশিয়া : মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর যোগ্য পুত্র মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী হাদীছের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে দারেমীর আরবী হাশিয়া (পাদটীকা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় হল এটি হারিয়ে গেছে। এর শেষ খণ্ডটির পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। এখন কারও নিকট আছে কি-না তা জানা যায়নি।

কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কিত এই ২৭টি গ্রন্থ গযনভী পরিবারের আলেমগণ লিখেছেন বা তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে। এটি দ্বীনের অনেক বড় খিদমত, যা নিজেদের যুগে উক্ত আলেমগণ করেছিলেন।

সঊদী সরকারের সাথে সম্পর্ক :

এখানে এটা উল্লেখ করা সম্ভবত সংগত হবে যে, গযনভী পরিবারের আলেমদের সঊদী শাসকদের সাথেও সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, কোন এক সময়ে ব্যবসায়িক কারণে সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর দুই পুত্রের (মাওলানা আব্দুর রহীম গযনভী ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী) আরবের কিছু এলাকায় যাতায়াত ছিল। এই সূত্রে একবার তারা কুয়েত গেলে সেখানে নাজদ ও হিজাযের শাসক সুলতান আব্দুর রহমান ও তাঁর সম্মানিত পুত্র সুলতান আব্দুল আযীয বিন সঊদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। ঐ সময় এই দুই পিতা-পুত্র কুয়েতে অবস্থান করে নাজদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। গযনভী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে পিতা-পুত্র কিছু শিক্ষাও অর্জন করেন। নাজদ বিজয়ের পর তারা সেখানে তাদেরকে দরস-তাদরীসের সিলসিলা শুরু করারও দাওয়াত দেন। এভাবে এই দু'জন ব্যক্তি প্রায় পাঁচ বছর সেখানে

অবস্থান করেন এবং সঊদ বংশের কতিপয় ব্যক্তি ও নাজদবাসী তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।[২৫]

এসময় তাঁদের মাধ্যমে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের কতিপয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও উপমহাদেশে আসে। যেগুলো গযনভী বংশের আলেমগণ এবং এখানকার কতিপয় প্রকাশক প্রকাশ করে। মাওলানা ইসমাঈল গযনভী ও মাওলানা দাঊদ গযনভী বেঁচে থাকা পর্যন্ত সঊদ বংশের সাথে তাঁদের সম্পর্ক অটুট থাকে। উপমহাদেশের গযনভী বংশের আলেমগণ এই সম্মান অর্জন করেছিলেন যে, বর্তমান সঊদী শাসকদের সাথে সর্বপ্রথম তাদেরই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। যার ভিত্তি ছিল স্রেফ ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি।

কা'বার গিলাফ :

গযনভী বংশ সম্পর্কে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, মহামান্য বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন সঊদের হিজায বিজয়ের পর ১৩৪৬ হিজরীতে (১৯২৮ খ্রিঃ) সাইয়িদ আব্দুল্লাহ গযনভীর দুই পৌত্র মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী বিন সাইয়িদ আব্দুল জাব্বার গযনভী ও সাইয়িদ ইসমাঈল গযনভী বিন মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী অমৃতসরের অত্যন্ত দক্ষ বুননশিল্পীদের দ্বারা কা'বার গিলাফ তৈরী করান[২৬] এবং এই দুই নওজোয়ান

---

২৫. বাদশাহ আব্দুল আযীয হিজায বিজয়ের পর ১৯২৬ সালে হারামাইন শরীফাইন সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী সম্মেলন আহ্বান করেন। এতে সাইয়িদ আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী (মৃঃ ১৯৩০ খ্রিঃ), সাইয়িদ ইসমাঈল বিন আব্দুল ওয়াহিদ গযনভী (মৃঃ ১৯৬০ খ্রিঃ), সাইয়িদ দাঊদ গযনভী, মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, হাফেয হামীদুল্লাহ দেহলভী (মৃঃ ১৯৫০ খ্রিঃ) প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। তারা মাযারসমূহ ধ্বংসকরণ সহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সঊদী বাদশাহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীকে জোরালো সমর্থন প্রদান করেন *(ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ ও আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী, আহলুল হাদীছ ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়াহ (বৈরূত : দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিঃ/২০১৪ খ্রিঃ), পৃঃ ৪৫-৪৭)*। তাছাড়া বাদশাহ আব্দুল আযীয ১৯২৭ সালে সাইয়িদ ইসমাঈল বিন আব্দুল ওয়াহিদ গযনভীকে ভারতীয় হাজীদের জন্য সঊদী প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রায় ৩০ বছর এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন *(ঐ, পৃঃ ৪৭)*।-অনুবাদক।

২৬. মিসর সরকার প্রত্যেক বছর কা'বার জন্য গিলাফ প্রেরণ করত। কিন্তু ১৯২৮ সালে সঊদী ও মিসর সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে মিসর গিলাফ

এই গিলাফ মক্কা মুকাররমায় নিয়ে গিয়ে বাদশাহ আব্দুল আযীযের নিকট পেশ করেন। আর এটি কা'বা ঘরে লটকানো হয়। এটিই প্রথম (এবং শেষ) কা'বার গিলাফ ছিল, যেটি অত্যন্ত সংগোপনে উপমহাদেশের গযনভী বংশের দুই তরুণ আলেম মক্কায় নিয়ে যান এবং এর দ্বারা কা'বা ঘরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়।

মাওলানা ইসমাঈল গযনভী ১৩৭৯ হিজরীর ১৯শে যিলহজ্জ (১৩ই জুন ১৯৬০ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন এবং মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাউদ গযনভী ১৮৯৫ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ বা ১৮৯৫ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন (১৩১৩ হিঃ) এবং ১৯৬৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (২৯শে রজব ১৩৮৩ হিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরের কীর্তি :

পূর্বে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের রচনাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গযনভী আলেমদের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সেগুলো প্রকাশের সূচনা হয় এবং ঐ সকল সম্মানিত ইমামদের কতিপয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও আরব দেশ থেকে উক্ত খান্দানের মাধ্যমেই উপমহাদেশে পৌঁছে। এ ব্যাপারে এটাও শুনুন যে, মাওলানা গোলাম রসূল মেহেরই সর্বপ্রথম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৩৪৩ হিজরীতে (১৯২৫ খ্রিঃ) এই গ্রন্থটি 'সীরাতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া' শিরোনামে ফারূকগঞ্জ, লাহোরে অবস্থিত আল-হেলাল বুক এজেন্সীর মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আযীয আফেন্দী প্রকাশ করেন। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও ইমাম ইবনু তাইমিয়ার প্রথম জীবনীগ্রন্থ। এর পূর্বে (উপমহাদেশে) আরবী বা উর্দূ কোন ভাষাতেই গ্রন্থাকারে ইমাম ছাহেবের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অবশ্য তাঁর সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌর পত্রিকা 'আন-নাদওয়াহতেও এ বিষয়ে কতিপয় প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছিল।

প্রেরণ করেনি। ফলে বাদশাহ আব্দুল আযীয ইসমাঈল বিন আব্দুল ওয়াহীদ গযনভী ও মাওলানা দাঊদ গযনভীকে গিলাফ তৈরির দায়িত্ব দেন *(আহলুল হাদীছ ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়াহ, পৃঃ ৬৫)*।-অনুবাদক।

মাওলানা গোলাম রসূল মেহের ১৩১২ হিজরীর ১৮ই শাওয়াল (১৩ই এপ্রিল ১৮৯৫ খ্রিঃ) জলন্ধর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) ফুলপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিকদের মধ্যে গণ্য করা হত। বিংশ শতকের সাথে সম্পর্কিত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বাদশাহ আব্দুল আযীযের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিজায বিজয়ের পর তাঁর দাওয়াতেই তিনি মক্কা মু'আযযামায় গিয়ে হজ্জ করেন এবং বিভিন্ন সময় মহামান্য বাদশাহর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ই নভেম্বর (২৭শে রামাযান ১৩৯২ হিঃ) লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

নওয়াব ওয়াহীদুয্যামানের খিদমত :

নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান হায়দারাবাদীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এক বুযুর্গ কোন এক সময়ে আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে মুলতানে বসতি গেড়েছিলেন। নওয়াব ছাহেবের দাদা মাওলানা মুহাম্মাদ মুলতানে পাঠদানরত অবস্থায় কোন কাজে লক্ষ্ণৌ যান। অতঃপর ওখানকার জ্ঞানপিপাসুদের পীড়াপীড়িতে সেখানে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল মাওলানা মসীহুয্যামান। তিনি কানপুর যাত্রা করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল হয়ে যান। সেখানে তাঁর গৃহে ১২৬৭ হিজরীতে (১৮৫০ খ্রিঃ) এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। যার নাম রাখেন ওয়াহীদুয্যামান। বড় ভাই হাফেয বদীউয্যামানের কাছে ওয়াহীদুয্যামানের পড়াশোনার হাতে খড়ি হয়। অতঃপর বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারীর নিকট থেকেও জ্ঞানার্জনের সুযোগ তাঁর ঘটে। হাদীছের দরস গ্রহণের জন্য দিল্লী যাত্রা করে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ইলমের দরজায় কড়া নাড়েন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছের সনদ লাভ করে গর্বিত হোন। অতঃপর অনেক জায়গায় যান এবং অসংখ্য আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পিতার সাথে হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) চাকুরী শুরু করেন এবং দ্রুততার সাথে পদোন্নতি পেতে থাকেন। এক সময় তাঁকে সেখানকার হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করা হয়। কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯০০ সালে (১৩১৭ হিঃ) চাকুরী পাওয়ার পর ৩৪ বছর হায়দারাবাদ রাজত্বে চাকুরী

করেন। তিনি অধিক অধ্যয়নকারী ও গভীর মনীষার অধিকারী আলেম ছিলেন। মেধা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং ধীশক্তি ছিল প্রখর। তিনি কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন, যেটি প্রথমবার মাওলানা আব্দুল গফুর গযনভী ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল গযনভী অমৃতসর থেকে প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে যা উল্লেখিত হয়েছে।

উপমহাদেশের ইনিই প্রথম আলেম যিনি মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্র সহজ-সরল ও বোধগম্য উর্দূ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলো দারুণ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। নওয়াব ওয়াহীদুয্যামান খান ১৩৩৮ হিজরীর ২৫শে শা'বান (১৫ই মে ১৯২০ খ্রিঃ) হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি স্বীয় পিতা মসীহুয্যামানকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি বলেন, 'এখন কলস জীবনের পানি থেকে শূন্য হয়ে গেছে'। এর ব্যাখ্যা হল এবার মৃত্যু অত্যাসন্ন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটী ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম, যিনি মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর প্রথম যুগের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি 'ফায়যুল বারী' নামে ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ করেন ও শরাহ লিখেন। এই শরাহটি ছহীহ বুখারীর সাতটি শরাহকে সামনে রেখে লেখা হয়েছিল। শরাহগুলো হল- ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী, কাওয়াকিবুদ দারারী, তায়সীরুল কারী, মিনাহুল বুখারী ও হাশিয়া সিন্ধী। ফায়যুল বারী বড় সাইজের দশটি বৃহৎ খণ্ডে হাযার হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী। উর্দূতে এ বিষয়ে এটিই প্রথম অনুবাদ ও শরাহ, যা মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র এবং শিয়ালকোটের খ্যাতিমান আলেমের আয়াসসাধ্য অতুলনীয় কীর্তি। ১৩১৮ হিজরীতে (১৯০১ খ্রিঃ) এই অনুবাদ ও শরাহ সম্পন্ন হয় এবং লাহোরের পুস্তক ব্যবসায়ী মাওলানা ফকীরুল্লাহ এটি প্রকাশ করেন। মাওলানা ফকীরুল্লাহ স্বীয় যুগের খ্যাতিমান আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন অনুবাদক, ভাষ্যকার এবং প্রকাশককে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঠাঁই দেন।

মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী :

ভারতের বিহার প্রদেশে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী।[২৭] তিনি ১২৭৩ হিজরীর ২৭শে যিলকদ (১৮৫৭ সালের ১৯শে জুলাই) জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় যুগের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। শেষে ১২৯৬ হিজরীর মুহাররম (জানুয়ারী ১৮৭৯ খ্রিঃ) মাসে মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইনের কাছ থেকে হাদীছের সনদ গ্রহণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুই বার মিয়াঁ ছাহেবের নিকটে যান এবং সর্বমোট আড়াই বৎসর তাঁর দরসের মজলিসে শামিল থাকেন। জ্ঞানার্জনের পর পাঠদানের খিদমত আঞ্জাম দেন এবং গ্রন্থ রচনার সাথেও যোগসূত্র বিদ্যমান থাকে। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো শামিল রয়েছে।

১. গায়াতুল মাকছূদ ফী হাল্লি সুনানি আবীদাঊদ : এই নামে সুনানে আবুদাঊদের এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা লেখার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, যা বেশ কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হবে। কিন্তু এর শুধুমাত্র এক খণ্ড দিল্লীর আনছারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৮] সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কতদূর পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, একুশ পারার ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এর মাত্র দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি খোদাবখশ পাটনা লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যান্য খণ্ডগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না।

২. আওনুল মা'বূদ আলা সুনানি আবীদাঊদ : এটিও চারটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত[২৯] সুনানে আবুদাঊদের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটিকে 'গায়াতুল মাকছূদ'-এর সারসংক্ষেপ আখ্যায়িত করা হয়। ৭ বছরে এটির রচনা সমাপ্ত হয় এবং প্রথমবার ১৩১৮-১৩২৩ হিজরী পর্যন্ত ৫ বছরে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ আলেমদের মধ্যে এই গ্রন্থের অপরিসীম গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন।

---

২৭. শামসুল হক আযীমাবাদী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫।-অনুবাদক।

২৮. সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, করাচীর হাদীছ একাডেমী থেকে এর মোট ৩ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক।

২৯. আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মদীনা মুনাউওয়ারাহ থেকে এটি ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক।

উপমহাদেশে এ বিষয়ে এটিই প্রথম হাদীছের খিদমত, যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী তৌফিক লাভ করেন।

৩. আত-তা'লীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী : মাওলানা আযীমাবাদী স্বীয় গবেষণালব্ধ টীকা সহ প্রথমবার হাদীছের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দারাকুতনীর 'মতন' (এ্বীঃ) প্রকাশ করেন। ১৩১০ হিজরীতে দিল্লীর ফারূকী প্রেস থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর ফটোকপি পাকিস্তানেও মুদ্রিত হয়েছে। তিনি হাদীছ বিষয়ে অনেক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আমি আমার 'দাবিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। এতে তাঁর কিছু খ্যাতিমান ছাত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেছি এবং এটাও লিখেছি যে, তাঁর পরামর্শে কোন আলেম কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো কতটা গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী মাত্র ৫৬ বছর আয়ু পান এবং ১৩২৯ হিজরীর ১৯শে রবীউল আওয়ালে তিনি (১৯১১ সালের ২০শে মার্চ) পরপারে পাড়ি জমান।

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী :

মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর[৩০] জন্মস্থান আযমগড় যেলার (ইউপি) মুবারকপুর গ্রাম এবং জন্মসন ১২৮২ হিঃ (১৮৬৫ খ্রিঃ)। তিনি অত্যন্ত নরম মনের অধিকারী, আপাদমস্তক বিনয়ী ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক আলেমে দ্বীন ছিলেন। অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। কিছুদিন হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর দরসের মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। হাফেয ছাহেব নিজের এই ছাত্রের যোগ্যতায় বিমুগ্ধ ছিলেন এবং তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর খিদমতে হাযির হন এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। এটি ১৩০৬ হিজরীর (১৮৮৯ খ্রিঃ) ঘটনা। ঐ সময় মাওলানা মুবারকপুরী ২৩ বছরের যুবক ছিলেন এবং মিয়াঁ ছাহেবের বয়স ৮৬ বছর অতিক্রম করেছিল। তিনি মিয়াঁ ছাহেবের কাছ থেকে ছহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী এবং সুনানে আবুদাউদ পুরাপুরি

৩০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, জুন-আগস্ট ২০০৫।-অনুবাদক।

পড়েন। এসব গ্রন্থ ছাড়াও তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহের কতিপয় গ্রন্থ তাঁর নিকট পড়েন এবং সনদ গ্রহণ করেন।

মাওলানা মুবারকপুরী বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং অনেক গ্রন্থও লিখেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল তিরমিযীর শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' (تحفة الأحوذى)। উপমহাদেশে তিনিই প্রথম তিরমিযীর ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। এটি চারটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। ৩৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এ গ্রন্থের উপর তাঁর ভূমিকা রয়েছে। যেটি স্বতন্ত্র খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। ভূমিকা সহ তুহফাতুল আহওয়াযী মোট পাঁচ খণ্ড।[৩১] এটি মাওলানা মুবারকপুরীর হাদীছের এমন খিদমত, যার কারণে তিনি উপমহাদেশের আলেমদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ১৩৫৩ হিজরীর ১৬ই শাওয়াল (১৯৩৫ সালের ২২শে জানুয়ারী) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী :

মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী[৩২] উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর নিকটাত্মীয় ছিলেন। ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ খ্রিঃ) মুবারকপুর নামক স্থানে (যেলা আযমগড়) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন মাদরাসার অসংখ্য যোগ্য শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৩৪৫ হিজরীতে (১৯২৭ খ্রিঃ) 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' (দিল্লী) থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সকল পরীক্ষায় সবর্দা প্রথম হতেন। ফারেগ হওয়ার পর 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'র পরিচালক শায়খ আতাউর রহমান সেখানেই তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছিলেন। অতঃপর অসংখ্য আলেম ও ছাত্র তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।

---

৩১. বৈরূতের দারুল ফিকর থেকে এটি ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।-অনুবাদক।
৩২. ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, জুন-সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর ২০১০। -অনুবাদক।

পাঠদানের পাশাপাশি গ্রন্থ রচনাও করেন। এর সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ রচনার সময় মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিলে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানীকেই তাঁর সাহায্যকারী নিযুক্ত করা হয়। অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দেন।

হাদীছের গবেষণালব্ধ খিদমতের ব্যাপারে মাওলানা রহমানীর এক বিশাল বড় কীর্তি হল মিশকাত শরীফের শরাহ। যার পুরা নাম ‘মির‘আতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ’ (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)। এই শরাহটি সমাপ্ত না হলেও যতটুকু হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। প্রথমে এই গ্রন্থটি মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর তত্ত্বাবধানে মাকতাবা সালাফিয়া (লাহোর) থেকে লিথো প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। সেই সময় ছাপার এটিই প্রচলন ছিল। অতঃপর এই গ্রন্থটি জামে‘আ সালাফিয়া (বেনারস) কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চমৎকার টাইপে ৯ খণ্ডে প্রকাশ করে। ভারত, পাকিস্তান ও আরব দেশসমূহের ইলমী পরিমণ্ডলে এটি সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। উপমহাদেশে ইলমী ও তাহকীকী দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম হওয়ার গৌরবের দাবীদার। এর পূর্বে এই ভূখণ্ডে মিশকাতের এ ধরনের শরাহ কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয়নি। মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ৮৫ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী (১৪১৪ হিজরীর ২৩শে রজব) নিজ জন্মভূমি মুবারকপুরে (যেলা আযমগড়) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী :

এখন মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরীর পিতা মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর অনেক বড় অগ্রগণ্য ইলমী অবদান লক্ষ করুন! তিনি যেসব মুহাদ্দিছের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী অধিক অধ্যয়নকারী আলেম ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। পাঠদানের পাশাপাশি তাঁর রচনার সিলসিলাও জারি থাকত। ওলামায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কে তাঁর বিশেষ

আগ্রহ ছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর 'আখবারে আহলেহাদীছ' (অমৃতসর) পত্রিকায় ১৯১৮ সালের ৩০শে আগস্ট আহলেহাদীছ আলেমদের জীবনী প্রকাশের একটা সিলসিলা শুরু হয়েছিল। ১৯২২ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চার বছর যেটা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে উপমহাদেশের ৮২ জন আহলেহাদীছ আলেমের জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর শুভ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল।

মাওলানা মুবারকপুরী উপমহাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলো ছাড়া তিনি 'সীরাতুল বুখারী' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, পুরো উপমহাদেশে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। উর্দূ ভাষায় এটিই প্রথম গ্রন্থ যাতে বিস্তারিতভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে এবং মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর মর্যাদার সকল দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিদ্বান মহলে এই গ্রন্থটি দারুণ গ্রহণযাগ্যতা অর্জন করেছে। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় রচিত কোন গ্রন্থও এর মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। ১৩২৯ হিজরীতে (১৯১১ খ্রিঃ) প্রথমবার 'সীরাতুল বুখারী' প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে ভারতেও প্রকাশিত হয় এবং পাকিস্তানের কতিপয় প্রকাশনীও প্রকাশ করে।

ভারতের একজন বিজ্ঞ গ্রন্থকার ও অনুবাদক ড. আব্দুল আলীম আব্দুল আযীম বাস্তাবী মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর এই উর্দূ গ্রন্থের (সীরাতুল বুখারী) আরবী অনুবাদ করেন। যেটি তাহকীক ও তাখরীজ সহ প্রকাশিত হয়েছে এবং আরব বিশ্বের আলেমগণ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন।

এটা পরম সৌভাগ্যের কথা যে, উর্দূ ভাষাতে ইমাম বুখারীর প্রথম জীবনী লেখার মর্যাদা একজন ভারতীয় আলেম লাভ করেন এবং তার প্রথম আরবী অনুবাদ, তাহকীক ও তাখরীজের মুকুটও একজন ভারতীয় আলেমের মাথায় শোভা পায়।

মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী গ্রন্থ পাঠে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কোন ব্যবসায়ীর নিকট নতুন কোন গ্রন্থ আসলে এবং তিনি সেটা অবগত হলে যেকোন মূল্যে তা ক্রয় করার চেষ্টা করতেন। গ্রন্থের প্রতি এই আকর্ষণ ও ভালবাসাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন তিনি দিল্লীর জামে মসজিদ এলাকায় দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে একটি গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য

যান। বই ক্রয় করে চাঁদনী চকে ঘণ্টাঘরের নিকটে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়ি এসে পড়ে। যার উপর কোন আরোহী ও চালক ছিল না। দ্রুত ধাবমান ঘোড়াটি মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীকে পিষ্ট করে চলে যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। সদ্য ক্রীত গ্রন্থটি তাঁর হাতেই ছিল, যার সবুজ রংয়ের টাইটেল তাঁর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায়, এই গ্রন্থটি নিজ সবুজ (এবং রক্তের লাল) রং সহ তাঁর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ১৯২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৩৪২ হিজরীর ১৮ই রজব) এই দুর্ঘটনা ঘটে। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘ঊন*।

ড. যিয়াউর রহমান আ‘যমী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বরকতময় হাদীছের প্রচার-প্রসার নবুঅতের যুগ থেকে অব্যাহত আছে এবং ইনশাআল্লাহ সর্বদা অব্যাহত থাকবে। মানুষেরা নিজেদের জ্ঞান ও অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এই কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন থাকবে। বর্তমান যুগে হাদীছের খাদেমদের দীর্ঘ তালিকায় আযমগড় যেলার ড. যিয়াউর রহমান আ‘যমীর নাম অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ড. ছাহেব ১৯৪৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ হিন্দুদের আর্য সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ড. ছাহেব মাধ্যমিক পর্যন্ত নিজ গ্রামে শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর আযমগড়ের শিবলী কলেজে ভর্তি হন। যেখানে মাধ্যমিক ক্লাসেরও ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৯ সালে তিনি এই কলেজের হাইস্কুল (শাখা) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি স্কুল পাশ করে কলেজে ভর্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইত্যবসরে এক বিশাল বড় বিপ্লব তাঁর জীবনের দুয়ারে কড়া নাড়ে। অধ্যয়নের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহই তাঁকে ইসলাম সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করে এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এরপরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি মদীনা মুনাউওয়ারায় পৌঁছে যান এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ফারেগ হওয়ার পর সেখানেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা সেখানে রাতের খাবার গ্রহণ করি এবং অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকে। আমার মনে

পড়ছে ঐ সময় তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষদের ডীন ছিলেন। এর ৮ বছর পর ২০০৮ সালের ২৯শে জুন মদীনা মুনাউওয়ারাতেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। এবারও রাতের খাবার তাঁর বাড়িতেই খাই। ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ ও মাওলানা আব্দুল মালেক মুজাহিদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দু'জন ব্যক্তি এই অধমের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রিয়াদ থেকে এসেছিলেন। এঁরা দু'জন রিয়াদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আমি রাতে ড. আ'যমীর বাসায় থাকি এবং আমরা দু'জন অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করতে থাকি।

ঐ সময় ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী হাদীছ সম্পর্কে এমন কাজ করছিলেন, যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। তিনি এমন একটি হাদীছের গ্রন্থ সংকলন করছিলেন, যেটি সকল ছহীহ হাদীছকে শামিল করবে। তিনি এই সংকলনের নাম নির্ধারণ করেছিলেন 'আল-জামে আল-কামেল ফিল হাদীছ আছ-ছহীহ আশ-শামেল' (الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل)। ২০০১ সালের জুনের শেষাবধি এর ৯টি বৃহৎ খণ্ড সংকলিত হয়েছিল। যাতে ঈমান, ইলম ও ইবাদত অর্থাৎ ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কিত ছহীহ হাদীছ সমূহ সকল হাদীছ গ্রন্থ থেকে যাচাই-বাছাই করে একত্রিত করা হয়েছিল। এ সকল তথ্য-উপাত্ত সুবিন্যস্ত অবস্থায় তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। ড. ছাহেবের ধারণা এমনটা ছিল যে, অবশিষ্ট খণ্ডগুলো সমাপ্ত হলে সকল ছহীহ হাদীছের সংখ্যা দাঁড়াবে ১২/১৫ হাযার। তিনি ২০০০ সালের দিকে এই কাজ শুরু করেছিলেন এবং ২০১৩ সালে তা সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এমন কাজ যেটা কোন আলেম অদ্যাবধি করেননি। কেবল ড. যিয়াউর রহমান আ'যমী সেদিকে মনোযোগ দেন এবং ইনশাআল্লাহ বর্তমানে তা সমাপ্তের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে থাকবে।

আমি 'গুলিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে হাদীছের খাদেমদের আলোচনায় ড. ছাহেবের উপর বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু লিখতে পারিনি। বর্তমানে ঐ ধরনের গ্রন্থ 'চামানিস্তানে হাদীছ' গবেষণাধীন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

এক মহিলার সোনালী কীর্তি :

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তাঁর ছহীহ বুখারী সম্পর্কিত অত্যন্ত চমৎকার একটি কাজের আলোচনা করা এখানে যরূরী। যেটি করেছেন লাহোরের গাযালাহ হামিদ বাট নাম্নী এক মহিলা। এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সামান্য ভূমিকা।

লাহোরের এক খ্যাতিমান আলেম ছিলেন প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম। যিনি ১৯০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী (১৩২৬ হিজরীর ২৩শে যিলহজ্জ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারে ইলম ও আমলের অনন্য সম্মিলন পাওয়া যেত। তিনি আরবীতে এম.এ করেন এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল পর তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৭-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি লাহোর সরকারী কলেজে আরবী সাহিত্য পড়াতে থাকেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের সিনিয়র সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৪৮ সালের ২৪শে জুলাই 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ' নামে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ জামা'আতের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করলে প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূমকে এর সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়। আর মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। প্রফেসর ছাহেব ১৯৮৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূমের পুত্র মেজর যুবায়ের কাইয়ূম মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন সমবেদনা জানানোর জন্য আমাকে তাঁর বোন গাযালাহ হামিদ বাটের বাড়িতে নিয়ে যান। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে মুহতারামা গাযালাহ বলেন, তিনি ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবীতে এম.এ করেছিলেন এবং 'শুরূহে ছহীহ বুখারী' (شروح صحيح بخارى) শিরোনামে এম.এ থিসিস করেছিলেন। আমি একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। আমি সেই সময় 'ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ'-এর সাথে জড়িত ছিলাম। ইদারার পক্ষ থেকে আমি ঐ থিসিসটি গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থসমূহ লেখার সূচনা কবে হয়েছিল এবং কোন কোন আলেম এই বরকতপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন, সম্মানিতা লেখিকা বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা

করেছেন। উপমহাদেশে এটি ব্যতিক্রমধর্মী কাজ, যেটি লাহোরের প্রাচীন আহলেহাদীছ পরিবারের যোগ্য মহিলা অত্যন্ত গবেষণা করে লিখেছেন। এতে ছহীহ বুখারীর দু'শর অধিক ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিচিতি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আমি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছি।

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী[৩৩] প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। যিনি অবস্থার চাহিদা অনুপাতে শিক্ষকতা ও বক্তৃতা প্রদানের সাথে সাথে গ্রন্থ রচনার সিলসিলাও অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ১৯০৯ সালের আগে-পরে ভূজিয়ান (যেলা অমৃতসর, পূর্ব পাঞ্জাব) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেসকল শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান ভূজিয়ানী, মাওলানা আব্দুল জাব্বার খাণ্ডিলবী, মাওলানা আবু সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভী, উসতাযে পাঞ্জাব মাওলানা আতাউল্লাহ লাক্ষাবী ও হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর নাম উল্লেখযোগ্য। মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর কাছ থেকে অনেক আলেম ও ছাত্র জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর হাশিয়া বা পাদটীকা 'আত-তা'লীকাতুস সালাফিয়্যাহ' (التعليقات السلفية) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ এই গ্রন্থের দারুণ সুখ্যাতি দান করেছেন এবং অসংখ্য আলেম এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে মাওলানা আতাউল্লাহ পাঞ্জাবের প্রথম আলেম, যিনি আরবী ভাষায় কুতুবে সিত্তাহ্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সুনানে নাসাঈর আরবীতে টীকা লিখেছেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ৩রা অক্টোবর (১৪০৮ হিজরীর ৯ই ছফর) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সারা জীবন সাদাসিধে ও ইলমের খিদমতে অতিবাহিত করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায :

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবাযের পাঠদান ও গ্রন্থ রচনাগত খিদমতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি ১৯৩৪ সালে ফিরোযপুর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত) 'চক বধুকে' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার সহ ঐ

---

৩৩. আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মে ২০০৫।-অনুবাদক।

এলাকার সকল মানুষ লাক্ষাবী আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং দ্বীনী মাসায়েল বুঝার জন্য তাঁদের নিকটেই প্রত্যাবর্তন করতেন। মুহাম্মাদ আলী জানবায 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' ফারেগ মাওলানা মুহাম্মাদ রহমানীর নিকট নিজ পিতৃপুরুষের গ্রামে (চক বধুকে) জ্ঞানার্জন শুরু করেন। ভারত ভাগের সময় এরা নিজ জন্মস্থান ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং লায়েলপুর যেলার (বর্তমানে ফায়ছালাবাদ) এক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ঐ সময় মুহাম্মাদ আলী জানবাযের বয়স ছিল ১৩ বছর। পাকিস্তানে তিনি বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। যাঁদের মধ্যে হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে তিনি জামে'আ সালাফিয়া (ফায়ছালাবাদ) থেকে ফারেগ হন এবং এখানেই ছাত্রদেরকে পড়াতে শুরু করেন। এরপরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি শিয়ালকোটে চলে যান এবং সেখানে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকেন। ওখানে 'জামে'আ রহমানিয়া' নামে মাদরাসাও চালু করেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবায দরস-তাদরীসের পাশাপাশি লেখালেখিও করেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে নিজেই প্রকাশ করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা হল সুনানে ইবনু মাজাহ্র শরাহ বা ব্যাখ্যা 'ইনজাযুল হাজাহ' (انجاز الحاجة)। আরবী ভাষায় রচিত এই শরাহটি ১২ খণ্ডে ও ৭৩৯১ পৃষ্ঠায় বিন্যস্ত। নিঃসন্দেহে এটি এ বিষয়ে এক অতুলনীয় শরাহ। আরো কতিপয় আলেম সুনানে ইবনু মাজাহ্র শরাহ লিখেছেন, কিন্তু কলেবর ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই শরাহটি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেটি উপমহাদেশের পাঞ্জাব প্রদেশের এই আলেম লিখেছেন। তিনি ১৪২৯ হিজরীর ১৫ই যিলহজ্জ (২০০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর) শিয়ালকোটে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর জানাযায় শরীক ছিলাম। আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের ছোট ভাই প্রফেসর ড. ফযলে ইলাহী তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান।

মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী :

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জানবাযের পূর্বে আরবী ভাষায় 'মিফতাহুল হাজাহ' (مفتاح الحاجة) নামে ইবনু মাজাহ্র হাশিয়া বা পাদটীকা লিখেছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী পাঞ্জাবী। তিনি ১৩১২ হিজরীর ১০ই

জুমাদাল উলা (১৮৯৪ সালের ১০ই নভেম্বর) এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন। তিনি অত্যন্ত নেক্কার ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম ছিলেন। মূলত তিনি হাযারা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) চলে গিয়েছিলেন এবং জীবনের বৃহদাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন। প্রায় ৮০ বছর আয়ু পেয়ে ১৩৬৬ হিজরীর (১৯৪৭ খ্রিঃ) দিকে মৃত্যুবরণ করেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর নিকট ইলমে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে মুসনাদে আহমাদের উর্দূ অনুবাদ এবং অন্যান্য গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড শামিল রয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আলাবী পাঞ্জাবী লিখিত এই হাশিয়া সম্মানিত টীকাকারের জীবদ্দশায় প্রথমবার ১৩১৫ হিজরীতে (১৮৯৭ খ্রিঃ) লক্ষ্ণৌতে সুনানে ইবনে মাজাহ্র সাথে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয়বার ১৩৯৪ হিজরীর জুমাদাল উলাতে (জুন ১৯৭৪ খ্রিঃ) 'ইদারাহ ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ', ডি ব্লক, সারগোধা, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়বারও এই প্রতিষ্ঠানই ১৩৯৮ হিজরীর মুহাররম মাসে (জানুয়ারী ১৯৭৮ খ্রিঃ) প্রকাশ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেন 'ইদারাহ ইহইয়াউস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' (সারগোধা)-এর পরিচালক মাওলানা আবুস সালাম মুহাম্মাদ ছিদ্দীক।

হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী :

শায়খুল হাদীছ মুফতী হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী পাকিস্তানের তাদরীসী ও তাছনীফী (পাঠদান ও গ্রন্থ রচনা) পরিমণ্ডলে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এক নাম। প্রথমতঃ তিনি হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ীর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানকার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ফারেগ হওয়ার পর হাফেয আব্দুর রহমান মাদানীর 'জামে'আ রহমানিয়া'-তে (লাহোর) শায়খুল হাদীছ হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। তিনি নিজেও 'মারকাযু আনছারিস সুন্নাহ' নামে একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ফারেগ হওয়া পরিশ্রমী ছাত্রদেরকে পাঠদান, লেখনী ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যদিও সেখানে অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উন্নত প্রতিষ্ঠান এবং লাহোরে এ বিষয়ে এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। এর কার্যক্রম দেখে

অনুমিত হয় যে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নতি করবে এবং এর অনেক সুফল দৃশ্যমান হবে। ইলমের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানীকে আমলের গুণেও গুণান্বিত করেছেন।

সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর ফৎওয়াসমূহ প্রকাশের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। 'ফাতাওয়া মাদানিয়াহ ছানাইয়াহ' নামে তাঁর ফৎওয়া সমষ্টির এক খণ্ড আমাদের প্রিয় বন্ধু মাওলানা কারী আব্দুশ শুকূর মাদানী নিজ প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল ইরশাদ', ২১৪ বি, সাবযাহ যার স্কীম, লাহোর থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করছেন। মূলত এখানে এটা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য যে, মুফতী হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী 'জায়েযাতুল আহওয়াযী' (جائزة الأحوذى) নামে ৪ খণ্ডে জামে তিরমিযীর শরাহ লিখেছেন। হাফেয ছাহেব পাঞ্জাব প্রদেশের প্রথম আলেম, যিনি আরবী ভাষায় এই বিশাল বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

হাফেয ছাহেব এখন আরবী ভাষায় ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা লিখছেন। অদ্যাবধি অনেক আলেম ছহীহ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে করেছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে ঐ সকল আলেমের শুকরিয়া আদায় করছি যে, তাঁরা এদিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং হাদীছের এই মর্যাদাপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে উর্দূভাষীদেরকে নবী (ছাঃ)-এর হাযার হাযার হাদীছ ও অগণিত নির্দেশনার সাথে পরিচিত করানোর বরকতপূর্ণ চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। আল্লাহই তাদেরকে এই কল্যাণকর কাজের প্রতিদান দানকারী এবং ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তিনি তা দিবেন। কিন্তু আরবী ভাষায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে উপমহাদেশের হাফেয ছানাউল্লাহ মাদানী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যিনি পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর মহানগরীর বাসিন্দা। দো'আ রইল আল্লাহ যেন তাঁকে এই বিশাল বড় কাজ সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেন।

শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর :

এখন সিন্ধু প্রদেশের দিকে আসুন! শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী- যাকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর বলা হয়- কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এই মৌলিক জ্ঞান সমূহের অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থের

তিনি হাশিয়া বা পাদটীকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলো দ্বারা শিক্ষক-ছাত্র উপকৃত হচ্ছেন। বিদ্বানমহলে সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। এই হাশিয়াগুলো থেকে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, কুরআন-হাদীছে দখল এবং ফিক্বহে গভীর পাণ্ডিত্য অনুমান করা যায়।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কে তাঁর গ্রহণযোগ্য খিদমত হল তিনি দু'টি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাভী ও তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়া বা পাদটীকা লিখেছেন। কুরআন মাজীদের একটি স্বতন্ত্র তাফসীরও লিখেছেন। ইলমে হাদীছের সকল দিক ও বিভাগে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি এই শাস্ত্রের অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। পাঠদান এবং গ্রন্থ রচনা উভয় দিক থেকে তিনি এই খিদমত করেছেন। এটা তাঁর অনেক বড় ইলমী অবদান যে, তিনি আরবীতে কুতুবে সিত্তাহর হাশিয়া লিখেছেন। ছহীহ বুখারী ও ইবনু মাজাহর হাশিয়া মিসরে এবং নাসাঈর হাশিয়া ভারতে মুদ্রিত হয়েছে। পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুত তাওয়াব মুলতানী (রহঃ) ছহীহ মুসলিমের হাশিয়া পৃথকভাবে প্রকাশ করেছেন। আবুদাঊদের অপ্রকাশিত হাশিয়া সাইয়িদ ইহসানুল্লাহ শাহ (ঝাণ্ডার পীর)-এর গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। সম্ভবত তিরমিযীর হাশিয়া সমাপ্ত হয়নি। তিনি মুসনাদে ইমাম আহমাদেরও হাশিয়া লিখেছেন। তিনি মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, হেদায়া ও হেদায়াহ-এর শরাহ ফাতহুল কাদীর-এর হাশিয়া লেখার মর্যাদাও লাভ করেছেন।

তাঁর বিচিত্র ইলমী অবদান থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনি একই সাথে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। মুফাসসিরে কুরআন, হাদীছের ব্যাখ্যাকার, খ্যাতিমান ফকীহ, শিক্ষক, মুবাল্লিগ, টীকাকার, গ্রন্থকার সবকিছুই ছিলেন তিনি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী লিখছেন,

كان زاهدا متورعا كثير الاتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'তিনি দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহভীরু এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র যথার্থ অনুসারী ছিলেন'। মাওলানা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী লিখেছেন, كان الشيخ عاملا

بالحديث لايعدل عنه إلى مذهب. 'তিনি হাদীছের প্রতি আমলকারী ছিলেন। হাদীছ ছাড়া কোন মাযহাবের দিকে তিনি মনোনিবেশ করতেন না'।

যে সময় শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী মদীনা মুনাউওয়ারায় অবস্থান করছিলেন, সেই সময় তাঁর এক স্বদেশী শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীও সেখানে অবস্থানরত ছিলেন। তিনিও অত্যধিক অধ্যয়নকারী খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। জামে' তিরমিযীর ভাষ্যকার এবং দুর্রে মুখতারের টীকাকার ছিলেন। মদীনা মুনাউওয়ারায় তাঁর দরসের খ্যাতি ছিল। সমকালীন শাসকগোষ্ঠী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দরবারে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল। হানাফী মাযহাবের এবং নকশবন্দী তরীকার অনুসারী ছিলেন। নিজ মাযহাবে অত্যন্ত কট্টর ছিলেন। মাসলাকের ভিন্নতার কারণে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীরের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর কারণে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধীকে বারবার কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। শায়খ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী ঐ সময়ের কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যার আলোকে তাদের দু'জনের দ্বন্দ্বের মূল কারণ প্রতিভাত হয় এবং স্বদেশী ও সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণে শায়খ আবুল হাসানকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী বর্ণনা করেন, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী হাদীছের প্রতি আমলকারী ছিলেন। হাদীছ ব্যতীত কোন মাযহাবের দিকে তিনি মনোনিবেশ করতেন না। রুকূর পূর্বে, রুকূ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় এবং দ্বিতীয় রাক'আত থেকে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন এবং বুকের উপর হাত বাঁধতেন। তাঁর সময়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধী স্বীয় ফিক্বহী মাসলাক থেকে কখনো সামান্যতম দূরে সরতেন না। এ ধরনের মাসআলা-মাসায়েলে শায়খ আবুল হাসান ও শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীর মাঝে মুনাযারা অব্যাহত থাকত। শায়খ আবুল হাসান মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নিজের মতের অনুকূলে দলীল বর্ণনা করলে শায়খ আবুত তাইয়িব তার প্রত্যুত্তর প্রদানে অপারগ হয়ে যেতেন। সেই দিনগুলোতে এই ঝগড়া সর্বদা চলত।

একদা এক তুর্কী হানাফী বিচারক হিসাবে মদীনা মুনাউওয়ারায় আসলে শায়খ আবুত তাইয়িব তাঁর নিকট যান এবং অভিযোগ করেন যে, শায়খ আবুল হাসান তাঁর ফিক্বহী মাযহাবের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। তিনি কতিপয় মাসআলা

উল্লেখ করে বলেন, তিনি এই মাসআলাগুলোতে হানাফী ইমামদের বিরোধী। বিচারক নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী শায়খ আবুল হাসানের অবস্থা ও ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করে অবগত হন যে, শায়খ আবুল হাসান প্রচলিত সকল জ্ঞানে ইমামের মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর নিকট এই সত্যও প্রকাশিত হয় যে, মদীনাবাসীদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ শায়খ আবুল হাসানের ভক্ত এবং তারা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। এরপরে উল্লিখিত বিচারক শায়খ আবুল হাসানের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন, নিজের জন্য দো'আ চান এবং সম্মানের সাথে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন।

শায়খ আবুত তাইয়িব সিন্ধীর এই অভ্যাস ছিল যে, যে বিচারকই মদীনা মুনাউওয়ারায় আসতেন তিনি তার নিকট যেতেন এবং শায়খ আবুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। কিন্তু কোন বিচারকই তাকে কিছু বলতেন না। প্রত্যেক বিচারক তাঁকে নিজের নিকট ডাকতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলে তাঁর জ্ঞান ও পরহেযগারিতায় এতটাই প্রভাবিত হতেন যে, সম্মানের সাথে বিদায় জানাতেন।

একদা এক গোঁড়া কাযী মদীনায় আসেন। অভ্যাস অনুযায়ী শায়খ আবুত তাইয়িব তাঁর নিকট শায়খ আবুল হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দরবারে তলব করেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নাভির নীচে হাত বাঁধতে এবং তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রাফ'উল ইয়াদায়েন না করতে নির্দেশ দেন। শায়খ উত্তর দেন, আমি আপনার এ কথা মানব না। যেটা হাদীছে উল্লেখ আছে আমি সেটাই করব এবং সেভাবেই ছালাত আদায় করব যেভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন বা আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। বিচারক অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের ও গোঁড়া ছিলেন। তিনি শায়খ আবুল হাসানের নিকট থেকে এই চাঁছাছোলা জবাব শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি তাঁকে জেলে প্রেরণ করেন এবং এমন সংকীর্ণ কক্ষে বন্দী রাখার নির্দেশ দেন যেটা সর্বদা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও তাঁকে বাইরে বের করা হত না। ৬ দিন তিনি সেই অন্ধকার কক্ষে বন্দী থাকেন। অতঃপর মদীনাবাসীরা শায়খের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিচারকের কথা মেনে নিয়ে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেন। শায়খ তাদেরকে উত্তর দেন, যে কথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) থেকে বর্ণিত নয়, আমি তা কখনো মানব না। আর যে আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত সেটা আমি কোন অবস্থাতেই ছাড়ব না। তিনি কসম খেয়ে এই কথা বলেছিলেন।

এরপর মদীনাবাসীরা পুনরায় বিচারকের নিকট যান এবং জোরালোভাবে শায়খের মুক্তি দাবি করেন। বিচারক কসম করে বলেন, আমি যদি তাকে ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে দেখি তাহলে আবার জেলে পুরব। মদীনাবাসীরা শায়খের কাছে আরয করেন যে, পিঠের উপর একটি কাপড় দিয়ে তার দুই পার্শ্ব দুই কাঁধে ঝুলিয়ে দিন। এর নীচে বুকের উপর হাত বাঁধুন এবং রাফ‘উল ইয়াদায়েন করুন। শায়খ এ প্রস্তাব মেনে নেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বিচারক মৃত্যুবরণ করেন এবং শায়খ পুনরায় পূর্বের মতো উন্মুক্ত বক্ষে হাত বাঁধা ও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা শুরু করেন।

মোদ্দাকথা, শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর অনেক বড় মুহাদ্দিছ এবং হাদীছের প্রতি আমলকারী আলেম ছিলেন। মসজিদে নববীতে তাঁর দরসে হাদীছের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। অসংখ্য শিক্ষক-ছাত্র তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হয়েছেন। ঘটনা সমূহের আলোকে অনুমিত হয় যে, তিনি কোন পুত্র সন্তান রেখে যাননি। তাঁর অছিয়ত মোতাবেক তাঁর যোগ্য ছাত্র মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি তাক্বলীদে শাখছীর বিরোধী এবং কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী ছিলেন।

জীবনী গ্রন্থগুলোতে সিন্ধুর এই খ্যাতিমান মুহাদ্দিছকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর বলে এজন্য লেখা হত যে, শায়খ আবুল হাসান নামে দু’জন ব্যক্তি ছিলেন এবং দু’জনই সিন্ধী ছিলেন। দু’জনেই মদীনা মুনাউওয়ারায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। পার্থক্য করার জন্য একজনকে শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী ছাগীর বলা হত। তাঁর মৃত্যু তারিখ ২৫শে রামাযান ১১৮৭ হিজরী (১০ই ডিসেম্বর ১৭৭৩ খ্রিঃ)। মৃত্যুস্থান মদীনা মুনাউওয়ারাহ। দ্বিতীয়জন হলেন শায়খ আবুল হাসান বিন মুহাম্মাদ ছাদেক সিন্ধী কাবীর। তাঁর পুরা নাম ছিল শায়খ আবুল হাসান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হাদী। উপাধি ছিল নূরুদ্দীন। ইনিই সেই শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী কাবীর, যার সম্পর্কে সম্মানিত পাঠক অবগত হলেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, তিনি ১১৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী

১১৩৯ হিজরী এবং অন্য আরেক বর্ণনায় ১১৩৮ হিজরীর ১২ই শাওয়ালের কথা বর্ণিত আছে। ১১৩৬ হিজরীরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই খ্যাতিমান আলেম ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছের মৃত্যুতে মদীনা মুনাউওয়ারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। জানাযার ছালাতে বহু লোক অংশগ্রহণ করে। তাঁর ধার্মিকতা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা এবং হাদীছের অপরিসীম খিদমতের দ্বারা সর্বশ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত প্রভাবিত ছিল। তাঁর মৃত্যুতে মহিলারাও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানাযার খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় এক নযর দেখার জন্য বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। দোকানদাররা শোকে দোকান বন্ধ করে দেয়। সরকারী লোকজন ও গভর্ণররা তাঁর খাটিয়া কাঁধে নেন। মাইয়েতকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে জানাযার ছালাত পড়ানো হয়। অতঃপর সিন্ধু বংশোদ্ভূত এই মহান মুহাদ্দিছকে বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। আলেম-ওলামা, ছাত্র এবং সর্বশ্রেণীর জনগণ তাঁর মৃত্যুকে এক বিশাল মর্মান্তিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করে এবং এজন্য অত্যন্ত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে।

মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী :

সিন্ধু প্রদেশের এক খ্যাতিমান আলেম ছিলেন মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী। যিনি সেখানকার ভাট্টি বংশের লোক ছিলেন। কয়েক প্রজন্মব্যাপী তাঁর বংশে ইলম ও আমলের সিলসিলা চলে আসছিল। মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী ১৩১১ হিজরীর ২৭শে রামাযান (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল) সিখর (সিন্ধু) যেলার খেতী ওরফে নবীয়াবাদ, গড়ী ইয়াসীন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় ও এলাকার আলেমদের কাছ থেকে তিনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর যুগটা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সময় ছিল এবং ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ীও স্বাধীনতা আন্দোলন সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং বন্দী হন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাসূরী (এম.এ ক্যান্টব), মাওলানা ইসমাঈল গযনভী এবং অন্যান্য অসংখ্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। তিনি গ্রন্থ রচনার খিদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন। সিন্ধীতে ছহীহ বুখারীর অনুবাদ

করেছেন। সিন্ধী ভাষায় এটাই ছহীহ বুখারীর প্রথম অনুবাদ ছিল। সিন্ধী গদ্য ও পদ্যে কুরআন মাজীদ ও কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানা মতে ছহীহ বুখারীর এই অনুবাদটিই হয়েছে, যেটি মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ ওফায়ী করেছেন।

তিনি ১৩৬৯ হিজরীর ২২শে জুমাদাল আখেরাহ (১৯৫০ সালের ১১ই এপ্রিল) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইনশাআল্লাহ 'চামানিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখা হবে।

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী :

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী এবং তাঁর পিতৃপুরুষের গ্রন্থ রচনা, পাঠদান ও ধর্মীয় খিদমত পরিমাপ করা খুব কঠিন। এই বংশের আলেমদের সম্পর্কে অনেক মানুষ বহু কিছু লিখেছেন এবং লিখছেন। তাদের মধ্যে এই গ্রন্থের লেখকের নামও শামিল রয়েছে। এই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বংশের আলেম সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী ১৩৪০ হিজরীর ২৯শে মুহাররম (১৯২১ সালের ২রা অক্টোবর) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪১৫ হিজরীর ১৯শে শা'বান (১৯৯৫ সালের ২১শে জানুয়ারী) মৃত্যুবরণ করেন।

সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী (যাকে ঝাণ্ডার পীর বলা হয়) আরবী, উর্দূ, সিন্ধী তিন ভাষাতেই বইপত্র রচনা করেছেন। ১১টি গ্রন্থ আরবী ভাষায়, ২৭টি উর্দূতে এবং ১৯টি সিন্ধীতে। হাদীছ বিষয়ে আরবীতে রচিত তাঁর একটি গ্রন্থের নাম হল 'আত-তা'লীকুন নাজীহ আলাল জামে আছ-ছহীহ' (التعليق النجيح على الجامع الصحيح) এটি ৯ খণ্ডে ছহীহ বুখারীর শরাহ। এখনো মুদ্রিত হয়নি। 'ফাতাওয়া রশীদিয়াহ' নামে সিন্ধী ভাষায় তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এটিও অপ্রকাশিত। সিন্ধু প্রদেশে দ্বীনের প্রচার ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর অগ্রগণ্যতার পরিসর অনেক বিস্তৃত।

সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদী :

কুরআন মাজীদের অগ্রগণ্য খিদমতের আলোচনায় সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আরবী, উর্দূ ও সিন্ধী তিন ভাষাতেই লিখেছেন। সর্বসাকুল্যে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১০৮টি। কুরআনের মতো হাদীছ বিষয়েও তিনি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন এবং যেই পদ্ধতিতে লিখেছেন, তার

দ্বারা তাঁকে এর অগ্রগণ্য খাদেমদের মধ্যে গণনা করা যায়। বক্তব্য, দরস-তাদরীস ও গ্রন্থ রচনায় এই বংশের আলেমরা উপমহাদেশে (বিশেষত সিন্ধু প্রদেশে) যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বহ। সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদীর জন্ম তারিখ ১৯শে যিলহজ্জ ১৩৪৩ হিজরী (১০ই জুলাই ১৯২৫ খ্রিঃ) এবং মৃত্যু তারিখ ১৭ই শা'বান ১৪১৬ হিজরী (৮ই জানুয়ারী ১৯৯৬ খ্রিঃ)।

সিন্ধুতে কবরপূজা ও পীরপূজার প্রভাব ছিল। লোকজন শরী'আত বিরোধী রসম-রেওয়াজে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, তা শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। এই বংশের আলেমগণ বিশেষ করে সাইয়িদ মুহিব্বুল্লাহ শাহ এবং সাইয়িদ বাদীউদ্দীন রাশেদী এই অগ্রগণ্য কৃতিত্বের অধিকারী হন যে, তাঁরা গোটা সিন্ধুতে ঘুরে ঘুরে বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষদের নিকট আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষ ইসলামের সরল পথের যাত্রী হয়। বক্তব্য ছাড়া লোকজন তাদের বইপত্রও পড়েছেন। যা তাদের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওলানা ইমামুদ্দীন জূনীজূ :

সিন্ধু প্রদেশের বর্তমান আলেমদের মধ্যে একজন আলেমে দ্বীন হলেন মাওলানা ইমামুদ্দীন জূনীজূ, যিনি ডুনজ (যেলা থারপারকার)-এর বাসিন্দা। তিনি মাওলানা হাফেয আব্দুস সাত্তার দেহলভী (রহঃ) কৃত উর্দূ অনূদিত কুরআনের সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর খিদমত হল মিশকাতের সিন্ধী ভাষায় অনুবাদকরণ। এছাড়া তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ইত্তিবাউর রাসূল, ইবনু সুলাইমান তামীমীর উছূলুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব-এর কিতাবুত তাওহীদ, মাওলানা ইসমাঈল শহীদ দেহলভীর তাকভিয়াতুল ঈমান, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কালিমা তাইয়িবা, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী দেহলভীর নামাযে মুহাম্মাদী এবং অন্যান্য অসংখ্য আরবী ও উর্দূ গ্রন্থ সিন্ধী ভাষায় অনুবাদ করেন। ইনিই প্রথম আলেম যিনি এই খিদমত আঞ্জাম দেন।

যেই পরিবেশে তিনি থাকছেন সেই পরিবেশে খাঁটি দ্বীনের প্রচার খুব কঠিন কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তৌফিক দিয়েছেন এবং তিনি এই কঠিনতম দায়িত্ব পালন করেছেন। যার শেষ ফলাফল ভাল হয়েছে।

৩য় অধ্যায়

বাহাছ-মুনাযারার উৎসাহ-উদ্দীপনা

'মুনাযারা' অর্থ কোন বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করা। চাই সেটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। মানুষ যখন অস্তিত্ব লাভ করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে পরিচিত হয়, তখন থেকেই মুনাযারা ও পারস্পরিক বাদানুবাদের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর যুগের বাদশাহ নমরূদের কথোপকথনকে আমরা মুনাযারা হিসাবে অভিহিত করতে পারি। ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর প্রায় দুই হাযার বছর পূর্বে বাবেল রাজত্ব উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল এবং তার সামরিক ও অর্থনৈতিক ভিত অত্যন্ত মযবুত ছিল। বাবেল বাদশাহ নমরূদ প্রভুত্বের দাবী করে নিজের স্বর্ণনির্মিত মূর্তি মন্দির সমূহে প্রতিস্থাপন করত মানুষকে তার পূজা করার হুকুম দেয়। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে নবী হিসাবে মনোনীত করে নমরূদ ও তার দেশের জনগণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, সমগ্র সৃষ্টির প্রভু একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করতে হবে। নমরূদ ও তার প্রজাদের জন্য এই ঘোষণাটি তাওহীদের দাওয়াত ছিল। কিন্তু নমরূদ তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে সূরা বাক্বারাহ-এর ২৫৮ নং আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِـــيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـــيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত

করাও তো। অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে (অর্থাৎ নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না’ *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

কুরআন মাজীদে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোকে কোন না কোনভাবে মুনাযারা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে ছাহাবায়ে কেরামের কিছু মুনাযারার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যে বিতর্কগুলো তাঁরা খারেজী ও অন্যদের সাথে করেছিলেন। মহামতি ইমামদের মুনাযারাগুলোরও হদিস পাওয়া যায়। সূরা আলে ইমরানের ৬১নং আয়াতে মুবাহালার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) নাজরান থেকে আগত ৬০ সদস্য বিশিষ্ট এক খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে যে মুবাহালার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিল তাদের নেতা।

উপমহাদেশে মুনাযারার ইতিবৃত্ত :

মুনাযারার ইতিহাস অনেক লম্বা। অনেক আলেমের সাথে অনেকের মুনাযারা হয়েছে। লোকজন আগ্রহভরে সেসব মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তার্কিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু এখানে উপমহাদেশের কতিপয় তার্কিকের নাম উল্লেখ করা হবে। কেননা এ গ্রন্থের সম্পর্ক উপমহাদেশের সাথে। খ্রিস্টান, হিন্দু (আর্য সমাজ ও সনাতন ধর্মাবলম্বী), কাদিয়ানী, শী‘আ ও হানাফীদের সাথে (ব্রেলভী ও দেওবন্দী) আহলেহাদীছ আলেমদের বিতর্ক হয়েছে। বিতর্কের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং মানুষেরা ভুল ও সঠিক বিষয় অবগত হতে পারে। সম্রাট আকবরের সময়ে উপমহাদেশে খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারার পরম্পরা শুরু হয়েছিল। আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ তার্কিকদের মধ্যে মাওলানা সা‘দুল্লাহ খান, মাওলানা আব্দুল্লাহ ও কুতুবুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর মুনাযারার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

শাহ আব্দুল আযীযের যুগ :

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর যুগে মুনাযারা বেশ গতি লাভ করেছিল। কারণ ঐ সময় প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় পাদ্রীদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। যাতে করে এখানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারের মাধ্যমে

মানুষদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মিশন চালানো যায়। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, এভাবে খ্রিস্টান ধর্ম প্রসার লাভ করবে এবং ইংরেজ শাসনও সুদৃঢ় হবে। শাহ আব্দুল আযীয এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করতেন।

নিম্নে খ্রিস্টানদের সাথে শাহ ছাহেবের কতিপয় বাহাছ-মুনাযারা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ঘটনা উল্লেখ করা হল-

(১) একদা শাহ আব্দুল আযীয দিল্লীর জামে মসজিদে কুরআন মাজীদের দরস দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একজন পাদ্রী এসে বললেন, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। প্রশ্নটা হল, মুসলমানদের নবীকে পৃথিবীতে দাফন করা হয়েছে এবং আমাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ আকাশে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের নবীর মর্যাদা মুসলমানদের নবীর চেয়ে বেশী বলে প্রতীয়মান হল। শাহ ছাহেব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দে উত্তর দিলেন, এই দলীল দ্বারা আমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর চেয়ে ঈসা (আঃ)-এর উচ্চমর্যাদা প্রমাণিত হয় না। কারণ ফেনা সর্বদা সমুদ্রের পানির উপরে থাকে। আর মুক্তা থাকে মাটির নীচে। এই উত্তরে ঈসা (আঃ)-কে ফেনা এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(২) এক পাদ্রী শাহ ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নবী কি আল্লাহ্র বন্ধু? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। পাদ্রী বললেন, আপনার নবী কি হুসাইনকে হত্যার সময় আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেননি যে, আমার দৌহিত্রকে হত্যা থেকে বাঁচানো হোক? না প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ কবুল করেননি? শাহ ছাহেব উত্তর দিলেন, আমাদের নবী আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন, তোমার নাতিকে লোকেরা শহীদ করেছে। আর শহীদের মর্যাদা অনেক বেশী। কিন্তু এ সময় আমার পুত্র ঈসার[৩৪] কথা মনে পড়ছে। যাকে তার অনুসারীরা শূলে বিদ্ধ করেছিল।

---

৩৪. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর প্রশ্নের জবাবে তার বিশ্বাস অনুযায়ী উক্ত জবাব প্রদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র নন; বরং তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল ছিলেন *(মারিয়াম ১৯/৩০)*। আর নাছারারা তাকে শূলেও বিদ্ধ করেনি; বরং আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন *(নিসা ৪/১৫৭-১৫৮)*।-অনুবাদক।

(৩) একবার এক হিন্দু শাহ ছাহেবকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ হিন্দু না মুসলমান? উত্তরে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ হিন্দু হতেন, তাহলে তিনি কখনো গাভী যবেহ হতে দিতেন না।

অন্যান্য আলেমদের মুনাযারা :

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীর পরে অগণিত আহলেহাদীছ আলেমের সাথে অনেক আলেমের বিতর্ক হয়েছে। তন্মধ্যে একজন তার্কিক ছিলেন মাওলানা সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী। যার সাথে মাওলানা শিবলী নোমানীর লিখিত বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল তাক্বলীদ পরিত্যাগ, সশব্দে আমীন বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রভৃতি। মাওলানা শিবলী নোমানী কট্টর প্রকৃতির হানাফী ছিলেন। 'রিওয়া' (যেলা আযমগড়) নামক স্থানে একটি মৌখিক বিতর্ক হয়েছিল। এ সকল বিতর্কের ফলশ্রুতিতে খোদ মাওলানা শিবলীর বংশে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। একটা সময়ে এসে মাওলানা শিবলীর মগজ থেকে মাযহাবী গোঁড়ামি অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল।

মাওলানা সাইয়িদ আমীর হাসান মুহাদ্দিছ সাহসোয়ানীও স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। ইস্কাট নামক অনেক বড় এক ব্রিটিশ পাদ্রীর সাথে তিনি বিতর্ক করেছিলেন। মাওলানার দলীল সমূহের দ্বারা পাদ্রী অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাহসোয়ানে তার যাতায়াত ছিল। তিনি নিজ দেশ লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। ১২৯১ হিজরীতে (১৮৭৪ খ্রিঃ) মাওলানার মৃত্যু হয়। পাদ্রী ইস্কাট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় শোক প্রকাশ করে প্রবন্ধ লিখে তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা বিশদভাবে প্রকাশ করেছিলেন।[৩৫]

মাওলানা আব্দুল বারী সাহসোয়ানীও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুনাযির ছিলেন। আগ্রাতে পাদ্রী ইমাদুদ্দীনের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু গণ্ডগোলের আশংকার অজুহাত দেখিয়ে বিতর্ক চলাকালে পাদ্রী ময়দান থেকে প্রস্থান করেন। আগ্রা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে পাদ্রীদের সাথে তাঁর তর্কযুদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রত্যেক বিতর্কে তিনি জয়লাভ করেন। একবার আগ্রাতে 'তুহফাতুল ইসলাম'

---

৩৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী, তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/১১৮-১২০।

গ্রন্থের লেখক আন্দ্রামান মুরাদাবাদী নামক এক হিন্দু তার্কিকের সাথে বিতর্ক করেন। মাওলানা জনসম্মুখে তাকে পরাজিত করেন। তিনি এটাও প্রমাণ করেন যে, এই গ্রন্থটি ঐ হিন্দুর রচিত নয়।[৩৬]

৫ম অধ্যায়ে 'জিহাদ আন্দোলনের কতিপয় সাহায্যকারী' উপশিরোনামে মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম, খ্যাতিমান মুহাক্কিক, স্বনামধন্য শিক্ষক ও অভিজ্ঞ তার্কিক ছিলেন। তিনি মাওলানা শিবলী নোমানীর 'সীরাতুন নু'মান' গ্রন্থের জবাবে 'হুসনুল বায়ান ফীমা ফী সীরাতিন নু'মান' (حسن البيان فيما في سيرة النعمان) নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এতে তিনি মাওলানা শিবলীর ঐতিহাসিক ভুলগুলো চিহ্নিত করেছেন। 'সীরাতুন নু'মান'-এর ২য় সংস্করণে মাওলানা শিবলী ঐ ভুলগুলো সংশোধন করেন। অতঃপর এ জাতীয় বিষয়ে তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেননি।

মাওলানা রহীমাবাদীর মুনাযারাগুলোতে উৎসবের আমেজ ছিল। ১৯০৩ সালের ১৬ই আগস্ট তিনি 'দিওরিয়া' নামক স্থানে আর্য সমাজের (হিন্দু) সাথে একটি বিতর্ক করেছিলেন। এটা ছিল সপ্তাহব্যাপী চলমান লিখিত বিতর্ক। প্রত্যেকদিন অগণিত হিন্দু ও মুসলমান অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বিতর্ক শুনতেন। সকল মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম ঐ বিতর্কে শামিল ছিলেন এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা রহীমাবাদীকেই তার্কিক নির্বাচন করেছিলেন। মাওলানা রহীমাবাদী ঐ বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৩০৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮ খ্রিঃ) বাংলার মুর্শিদাবাদ শহরে হানাফী আলেমদের সাথে 'তাক্বলীদ' বিষয়ে মাওলানা রহীমাবাদীর বিতর্ক হয়েছিল। পাঁচ দিন বিতর্ক অব্যাহত ছিল। সে যুগের অনেক আহলেহাদীছ ও হানাফী আলেম ঐ বিতর্কে শরীক ছিলেন। হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন তার্কিক বদলাতে থাকে। কিন্তু আহলেহাদীছদের পক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাওলানা রহীমাবাদীই তার্কিক ছিলেন এবং তিনিই বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন।

---

৩৬. ঐ ১/১২১-১২৫।

বক্তব্য, লেখনী, অনুবাদ, গ্রন্থ রচনা ও বাহাছ-মুনাযারায় মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (মৃঃ মার্চ ১৯৪১) অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনেক অগ্রগণ্য কৃতিত্ব রয়েছে। তিনিই প্রথম আলেম যিনি তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ করেন। সহজ-সরল ও বোধগম্য ঐ অনুবাদটি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। অনেক প্রকাশক সেটি প্রকাশ করেছে। তিনিই প্রথম আলেম যিনি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর 'ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেন। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহ বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এর অনুবাদ পড়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মাওলানা জুনাগড়ীকে পত্র লিখেন এবং অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর মুহাম্মাদী সিরিজও দারুণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ নামাযে মুহাম্মাদী, ছাওমে মুহাম্মাদী, হজ্জে মুহাম্মাদী, যাকাতে মুহাম্মাদী প্রভৃতি নামে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলো লোকজন অত্যন্ত আগ্রহভরে অধ্যয়ন করত। তিনি স্বীয় যুগের সফল তার্কিকও ছিলেন। আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনেক গুণের সমাহার ঘটিয়েছিলেন।

অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য পাটিয়ালায় একটি গ্রামের নাম ছিল 'পায়েল'। সেখানে একটি হিন্দু পরিবার বসবাস করত। এই পরিবারের ছেলে অনন্ত রাম অল্প বয়সে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার অন্তর ইসলামের নিকটবর্তী হতে থাকে। এখন তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ, শিখ নানক, খ্রিস্টান পাদ্রী এবং মুসলমান আলেমদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করেন এবং বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেন। তিনি মূলত হিন্দু ছিলেন। এজন্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে হিন্দু ধর্ম অধ্যয়ন করেন। এই ধর্ম সম্পর্কে দারুণ সব বিস্ময়কর তথ্য অবগত হন। হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে তিনি যে তথ্য লাভ করেন, তা ছিল রীতিমত আশ্চর্যজনক। বুদ্ধি-বিবেকের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ১৮৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১২৬৪ হিঃ) ঈদুল ফিতরের দিন মালেরকোটলায় (যেটি অবিভক্ত পাঞ্জাবের মুসলিম রাজত্বের রাজধানী ছিল) মুসলমান হন। তিনি ঈদগাহে জনসম্মুখে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং নিজেই নিজের নাম ওবায়দুল্লাহ রাখেন।

যোগ্য শিক্ষকদের নিকট অতি দ্রুত তিনি সকল দ্বীনী বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মালেরকোটলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি

ইসলামের অনেক বড় মুবাল্লিগ ও তার্কিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। অসংখ্য হিন্দু ও শিখ তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। তিনি 'তুহফাতুল হিন্দ' (تحفة الهند) নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিতে বিস্ময়কর সব কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেন। হিন্দু ধর্মের বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংবলিত উর্দূতে এটিই প্রথম গ্রন্থ। বিভিন্ন জায়গা থেকে এই গ্রন্থটি কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এবং যে অমুসলিম সেটি পড়েছে সে-ই মুসলমান হয়ে গেছে। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মালেরকোটলী ১৩১০ হিজরীতে (১৮৯৩ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

বাহাছ-মুনাযারার আলোচনায় কার কার নাম উল্লেখ করা যায়। অগ্রজ তার্কিকদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। পরবর্তীদের নাম তো গণনা করাই অসম্ভব। আহলেহাদীছ জামা'আতের অসংখ্য তার্কিককে এক লম্বা লাইনে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে। এটাও চিরন্তন সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিতর্কে তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ তার্কিক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিতর্কের ময়দানে আবির্ভূত হন।

সকল তার্কিকের নাম লেখাও কঠিন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী অনেক বড় একজন ব্যক্তি। পূর্বে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, দর্শন, মানতিক ও আরবী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক বড় তার্কিকও ছিলেন।

মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী, মাওলানা নূর হুসাইন ঘারজাখী, মাওলানা আব্দুল্লাহ মি'মার অমৃতসরী, সাইয়িদ আব্দুর রহীম শাহ মাক্কাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক লায়েলপুরী, মাওলানা আব্দুল আযীয মালেক মুলতানী ও অন্যান্য অসংখ্য আলেম রয়েছেন, যারা এক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন। লোকেরা তাদের মুনাযারা দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হয়েছেন। এঁরা ইসলামের অনেক বড় খাদেম ছিলেন।

হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী এই বিষয়ে যাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন তাদের মধ্যে তাঁর দুই ভাতিজা হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল রোপড়ী ও হাফেয আব্দুল

কাদের রোপড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৭] বিশেষত হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ীকে আল্লাহ এই বিষয়ে অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি কাদিয়ানী, ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের সাথে অসংখ্য বিতর্ক করেছেন। 'ফুতূহাতে আহলেহাদীছ (মীযানে মুনাযারা)' নামে দু'টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁর প্রায় সকল মুনাযারা সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমী, জামে'আ আহলেহাদীছ, চক দালগারা, লাহোর প্রকাশ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমীর ব্যবস্থাপকরা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। গ্রন্থাকারে সংকলিত এই মুনাযারাগুলো থেকে লোকেরা উপকৃত হবেন এবং একাডেমীর সদস্যদের জন্য দো'আ করবেন।

হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী যে পদ্ধতিতে বিতর্ক করতেন এবং প্রতিপক্ষকে যেভাবে ধমকি প্রদান করতেন, তা ছিল দারুণ প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতি। এরই ভিত্তিতে লোকজন তাঁকে 'সুলতানুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের বাদশাহ) উপাধি প্রদান করেন। আর এটা সম্পূর্ণ সঠিক উপাধি।

মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদীর (কুয়েত প্রবাসী) অনুরোধে এই গ্রন্থের লেখক মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবীর জীবনী লেখার তৌফিক লাভ করেছেন। ১৪৩১ হিজরীর রামাযান মাসে আমি এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছি। গ্রন্থটি দেড়শ পৃষ্ঠাব্যাপী। এতে কাদিয়ানী, খ্রিস্টান, শী'আ ও হানাফীদের সাথে মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবীকৃত সকল মুনাযারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী তাঁকে 'ফসতাযুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের শিক্ষক) বলে অভিহিত করতেন। তিনি বাস্তবেই একজন জাঁদরেল তার্কিক ছিলেন। সম্ভব হলে কোন ব্যক্তি কষ্ট করে মাওলানা নূর হুসাইন ঘারজাখী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মি'মার অমৃতসরী, সাইয়িদ আব্দুর রহীম শাহ মাক্কাবী, মাওলানা আব্দুল আযীয মালেক মুলতানী, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক লায়েলপুরী ও অন্যান্য আলেমদের মুনাযারাগুলো সংকলন করুক। এঁা আবশ্যক নয় যে, এই বিষয়ের সব কথাই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

---

৩৭. ঐতিহ্যবাহী রোপড়ী আহলেহাদীছ পরিবারের আলেমদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, রোপড়ী ওলামায়ে হাদীছ *(লাহোর : মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০১১)*। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৩।- অনুবাদক।

তবে যতটুকু সম্ভব লেখা উচিত। আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।

মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভীকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন! তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মুনাযারাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ মাওলানার জীবনীগ্রন্থ 'সীরাতে ছানাঈ'তে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাঁর পরে মাওলানা ফযলুর রহমান আযহারী স্বীয় গ্রন্থ 'রাঈসুল মুনাযিরীন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী'তে এই খিদমতই করেছেন।

ভারতীয় আলেম ও গ্রন্থকার, জামে'আ আছারিয়া, মউ (ইউপি)-এর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি 'তাযকিরাতুল মুনাযিরীন' (تذكرة المناظرين) শীর্ষক আকর্ষণীয় নামে দুই খণ্ডে গ্রন্থ লিখেছেন। যেটি ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, জামে'আ আছারিয়া, মউ (ইউপি)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০২ সালের জানুয়ারীতে (শাওয়াল ১৪২২ হিঃ) ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভারত ভাগের পূর্বের অর্থাৎ ১৮৩৫-১৯৪৬ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের আহলেহাদীছ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের মুবাহালা ও বাহাছ-মুনাযারার বিবরণী পেশ করা হয়েছে। ২য় খণ্ডে ভারত ভাগের পরের অর্থাৎ ১৯৪৭-২০০১ পর্যন্ত আহলেহাদীছ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাদের মুনাযারাগুলোর ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৪২৪ হিজরীর যিলহজ্জ (জানুয়ারী ২০০৪) মাসে এই খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এটিও মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদী আছারী উমরীর অগ্রগণ্য কৃতিত্ব।

আমাদের বন্ধু ড. বাহাউদ্দীন (মুহাম্মাদ সুলাইমান আযহার) ১২/১৩টি বৃহৎ খণ্ডে 'তাহরীকে খতমে নবুঅত'-এর বিভিন্ন খণ্ডে কাদিয়ানীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা সম্পর্কিত অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪র্থ অধ্যায়

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সময় তাদের ফিতনা-ফাসাদ লালনকারী মেধা যেসব ফিতনা সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলো প্রতিপালনে রসদ যুগিয়েছে, তন্মধ্যে এক বিশাল বড় ফিতনা কাদিয়ানী মতবাদ।[৩৮] এই ফিতনাকে দমন করার জন্য যারা সর্বপ্রথম ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা ছিলেন আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম। সংক্ষেপে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে 'মুবাল্লিগ' (ধর্ম প্রচারক), 'মুজাদ্দিদ' (সমাজ সংস্কারক), 'মাসীহ-এর সদৃশ', 'মাসীহ' প্রভৃতি দাবী করার এক পর্যায়ে ১৮৯১ সালে (১৩০৮ হিঃ) নবুঅত দাবী করে।[৩৯] এটি ছিল সরাসরি কুফরী এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা যে শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা থেকে প্রকাশ্য বিচ্যুতি। নবীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে আমরা অবগত হই যে, প্রত্যেক নবী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নতুন বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে তাঁদের উম্মাত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে নতুন উম্মাতের সাথে পূর্ববর্তী উম্মাতের মিল থাকলেও আক্বীদা ও আনুগত্যের স্বরূপ পাল্টে গিয়েছিল। মূসা (আঃ)-এর উম্মাতকে ইহুদী এবং ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে খ্রিস্টান বলে অভিহিত করা হয়েছিল। অতঃপর মুহাম্মাদ (ছাঃ) নবী হিসাবে প্রেরিত হলে তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে

---

৩৮. মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর একটি উক্তি থেকে এটা একেবারে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন সে বলেছে, 'ইংরেজরা আমাদের দ্বীনকে যেরূপ সাহায্য দিয়েছে সেরূপ হিন্দুস্তানের কোন মুসলিম শাসক দিতে পারেনি' *(দ্র. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে হাদীছ : 'খতমে নবুওয়াত', আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯, পৃঃ ১১)*।-অনুবাদক।

৩৯. ১৮৮২-১৮৯০ সাল পর্যন্ত মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে মুবাল্লিগ, মুজাদ্দিদ ও ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর সদৃশ, ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী 'প্রতিশ্রুত মাসীহ' (مسيح موعود), ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ 'ইমাম মাহদী' এবং সর্বশেষ ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ নবী ও রাসূল দাবী করে *(দ্র. মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়নে মেঁ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়াহ, ১৯৮১), পৃঃ ৩৯-৫২; আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯, পৃঃ ১১)*।-অনুবাদক।

মর্যাদাপূর্ণ 'মুসলিম' নামে ডাকা শুরু হয়। মুসলমানদের ইবাদতের ধরন ও আনুগত্যের পদ্ধতি পূর্ববর্তী জাতিসমূহ থেকে ভিন্ন। পূর্ববর্তী বিধি-বিধানের অনেক কিছুই ইসলামে 'মানসূখ' বা রহিত করা হয়েছে।

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক জীবনপ্রণালী বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের নবী, অনুসারী, মসজিদ, সামাজিক জীবনাচার ও আত্মীয়তা পৃথক। ফলকথা তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিয়েছিল এবং নিজেদেরকে একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করেছিল।[৪০] এজন্য তাদেরকে কাফের আখ্যাদান এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়া মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এখন এ সম্পর্কে আহলেহাদীছগণের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাক।-

কুফরীর প্রথম ফৎওয়া :

সর্বপ্রথম মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী মাঠে নামেন। তিনিই প্রথম আলেমে দ্বীন, যিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কুফরীর ফৎওয়া লিপিবদ্ধ করেন এবং স্বীয় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকটে সেটি উপস্থাপন করে তাতে তাঁর স্বাক্ষর নেন। এরপর ভারতের দূর-দূরান্তে বসবাসকারী দু'শ প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান আলেমের সাথে নিজে সাক্ষাৎ করে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঐ ফৎওয়া তাদেরকে শুনান। তাতে তারা তাঁদের সত্যায়নমূলক স্বাক্ষর করে সিল মেরে দেন। মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও তার সহচররা তাকফীরের এই ফৎওয়ার কারণে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মির্যা কাদিয়ানী এই হতবুদ্ধিতার প্রকাশ এভাবে করছে-

'পাঞ্জাবের আলেমগণ এবং ভারতের পক্ষ থেকে 'তাকফীর' (কাফের আখ্যাদান) ও 'তাকযীব' (মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ)-এর ফিতনা সীমা অতিক্রম

---

৪০. মির্যা কাদিয়ানী বলেছে, 'অন্যান্যদের সাথে আমাদের মতভেদ কেবল ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে নয়। বরং আল্লাহ্র সত্তা, রাসূল (ছাঃ), কুরআন, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত মোটকথা প্রত্যেক বিষয়ে রয়েছে'। তার প্রথম খলীফা নূরুদ্দীন বলেছে, 'ওদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ইসলাম এক এবং আমাদের অন্য' *(উদ্ধৃত : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দরসে হাদীছ : 'খতমে নবুওয়াত', আত-তাহরীক, অক্টোবর'৯৯, পৃঃ ১১)*।-অনুবাদক।

করেছে। শুধু আলেমগণ নন; বরং পীর-ফকীর ও তাদের খলীফারা পর্যন্ত এই অক্ষমকে কাফের ও মিথ্যুক প্রমাণে মৌলভীদের সাথে এক সুরে কথা বলছে। তাদের প্ররোচনার কারণে এমন হাযার হাযার লোক পাওয়া যায় যারা আমাকে খ্রিস্টান ও হিন্দুদের থেকেও বড় কাফের বলে জানে। এই তাকফীরের বোঝা নাযীর হুসাইনের কাঁধে থাকলেও অন্য আলেমদের অপরাধ হল তারা স্পর্শকাতর এই তাকফীরের বিষয়ে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও গবেষণার সহায়তা না নিয়ে নাযীর হুসাইনের দাজ্জালী ফৎওয়া দেখে বিনা বিচার-বিশ্লেষণে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যেটি প্রস্তুত করেছিলেন মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী।[৪১]

তাকফীরের উদ্যোক্তা :

এই ফৎওয়া সম্পর্কে অন্য জায়গায় মির্যা গোলাম আহমাদ লিখছে, 'মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন এই ফৎওয়া লিখে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীকে বলেন, আপনি সর্বপ্রথম এতে সিল মেরে মির্যা কাদিয়ানীর কুফরী সম্পর্কে ফৎওয়া দিয়ে দিন এবং মুসলমানদের মাঝে তার কাফের হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিন। যদিও এই ফৎওয়া ও উল্লিখিত মিয়াঁ ছাহেবের সিলমোহরের ১২ বছর পূর্বে এই গ্রন্থটি (বারাহীনে আহমাদিয়াহ) সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন- যিনি ১২ বছর পর প্রথম কাফের আখ্যাদানকারী হন- তিনিই তাকফীরের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং নিজ প্রসিদ্ধির কারণে সারাদেশে এই আগুনকে প্রজ্বলিতকারী ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী'।[৪২]

গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর এই স্বীকারোক্তি একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাকে কাফের সাব্যস্তকরণের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী। আর মিয়াঁ ছাহেব নিজ প্রসিদ্ধির কারণে সারা দেশে সেই আগুনকে প্রজ্বলিতকারী ছিলেন। অর্থাৎ মিয়াঁ ছাহেব সমগ্র ভারতের আলেম ও নেতৃবৃন্দের মাঝে নিজস্ব ইলমী মর্যাদা ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এই জ্ঞানগত মর্যাদা ও খ্যাতির কারণে সমগ্র দেশে এই ফৎওয়াটি ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ফৎওয়ার ভিত্তিতে মির্যা গোলাম আহমাদকে লোকজন কাফের আখ্যায়িত করে।

---

৪১. মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, আঞ্জামে আথাম (ছাপা : ১৮৯৭), পৃঃ ৪৫।
৪২. মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, তোহফায়ে গোলড়াবিয়াহ (কাদিয়ান ছাপা : ১৯১৪), পৃঃ ১২১।

এটি আজ থেকে কমবেশী সোয়াশ' (১২৫) বছর আগের কথা। সেই সময় যাতায়াতের ঐ সকল মাধ্যমের কোন অস্তিত্বই ছিল না, যেগুলো বর্তমান যুগে আমরা দেখছি। ছিল না মোটরগাড়ি, সড়ক ও ট্রেন। কাঁচা রাস্তায় মানুষজন পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে বা উট-ঘোড়ায় চড়ে সফর করত। মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর সাহস, দ্বীনের খিদমতের আগ্রহ এবং নবীপ্রেমের দাবী লক্ষণীয়। তিনি দূরবর্তী স্থানসমূহে নিজে গিয়ে অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ করে ঐ তাকফীরের ফৎওয়ায় স্বাক্ষর করান এবং তাদের সিলমোহর মেরে নেন। এই দৌড়ঝাঁপে মাওলানা বাটালভী অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকবেন বলে অনুমিত হয়।

ফৎওয়ায়ে তাকফীর-এর প্রচার ও প্রসার :

মাওলানা বাটালভীর জীবদ্দশায় প্রথমবার এই ফৎওয়াটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রায় ১০০ বছর পর 'পাক ও হিন্দ কে ওলামায়ে ইসলাম কা আওয়ালীন মুত্তাফাক্বাহ ফৎওয়া' শিরোনামে এই ফৎওয়াটি সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ, লাহোরের পক্ষ থেকে প্রকাশ করেন। যেটি ছিল বড় সাইজের ১৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী। এতে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের দু'শ আলেমের স্বাক্ষর রয়েছে, যারা নিজ নিজ এলাকায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। এভাবে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে কাফের সাব্যস্তকরণ সম্পর্কিত এই ফৎওয়াটি উপমহাদেশের সোয়াশ' বছর পূর্বের আলেমদের একটি গ্রহণযোগ্য ঐতিহাসিক দলীল। এর মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, ঐ সময় কোন্ কোন্ বড় আলেম কোথায় অবস্থান করতেন।

গ্রন্থাকারে খুব সুন্দরভাবে এই ফৎওয়াটিকে পুনরায় প্রকাশ করা উচিত এবং এর সংক্ষিপ্ত নাম হওয়া উচিত 'আওয়ালীন ফৎওয়ায়ে তাকফীর'। এতে এমন ভূমিকা লেখা উচিত যেখানে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের অগ্রণী ভূমিকার কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। ফৎওয়ায় স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদানকারী আলেমদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করার চেষ্টা করা উচিত।

তাকফীরের ফৎওয়া ছাড়াও মাওলানা বাটালভী সরাসরি মির্যার সাথে বাহাছ করেছেন, তাকে মুবাহালার আহ্বান জানিয়েছেন এবং লেখনীর মাধ্যমেই তার লেখনীর জবাব দিয়েছেন। মির্যার বিরুদ্ধে তিনি কঠিন প্রস্তুতি গ্রহণ করেন

এবং প্রত্যেকটি ময়দানে তাকে পরাজিত করেন। এ বিষয়ের গ্রন্থাবলী এবং মাওলানা বাটালভীর পত্রিকা 'ইশা'আতুস সুন্নাহতে এর বিস্তারিত বিবরণ মওজুদ রয়েছে। মাওলানা বাটালভী ১৮৪১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী (১২৫৬ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ) বাটালায় (যেলা গুরুদাসপুর) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২০ সালের ২৯শে জানুয়ারী (১৩৩৮ হিজরীর ৮ই জুমাদাল উলা) মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবীর এলহাম :

মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী পাঞ্জাবের সংস্কারক ও মুফাস্‌সিরে কুরআন হাফেয মুহাম্মাদ লাক্ষাবীর স্বনামধন্য পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু আলেম ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মির্যা গোলাম আহমাদের ব্যাপারে আমার নিকট এলহাম হয়েছে যে, إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী' *(ক্বাছাছ ২৮/৮)*। মির্যা কাদিয়ানী মিথ্যুক, অপবাদদাতা এবং ফেরাঊন ও হামানের দলভুক্ত। এর প্রেক্ষিতে মির্যা গোলাম আহমাদ লাক্ষাবীর জন্য কঠিন মৃত্যু কামনা করে এবং মাওলানাকে গালির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী পুত্রসন্তান থেকে বঞ্চিত থাকবেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে পুত্রসন্তান দান করেন। তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ আলী। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবী বর্ণনা করতেন, 'আমি মির্যা গোলাম আহমাদের বদদো'আর ফল। আমার জন্ম, আমার বেঁচে থাকা এবং লোকজনের সাথে আমার মেলামেশা মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মিথ্যার ঘোষণা ও প্রমাণ'।

মাওলানা মুহিউদ্দীন আব্দুর রহমান লাক্ষাবী ১২৫৪ হিজরীতে (১৮৩৮ খ্রিঃ) 'লাক্ষৌকে'তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৩ হিজরীর ১৫ই যিলক্বদ (২৭শে এপ্রিল ১৮৯৬ খ্রিঃ) মদীনা মুনাউওয়ারায় (মসজিদে নববী) মৃত্যুবরণ করেন। 'বাক্বী' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

কাদিয়ানে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর ভাষণ :

কাদিয়ানীদের প্রসঙ্গে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর আলোচনা অত্যন্ত যরূরী। সেই যুগে মাওলানা অমৃতসরী যেভাবে কাদিয়ানীদের প্রতিরোধ

করেছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পেশ করা সম্ভব নয়। লিখিত আকারে এবং বক্তব্য ও বিতর্কের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ময়দানে তিনি কাদিয়ানীদেরকে পরাস্ত করেছেন। নবুওয়াতের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ থেকে তার নিম্নস্তরের কাদিয়ানী মতবাদের প্রচারকদেরকে তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে মুকাবেলা করেছেন। তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমাদের সাথে লড়াই করার পর নিম্নস্তরের ঐসকল প্রচারকদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কী দরকার আছে। তিনি সর্বদা ধর্মীয় গুরুত্বকে সামনে রেখেছেন এবং সর্বত্র ছোট-বড় সব কাদিয়ানীর পিছু নিয়েছেন।

তিনিই প্রথম আলেম যিনি জনসম্মুখে বৃহৎ পরিসরে মুনাযারার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। ১৯০২ সালে (১৩২০ হিঃ) মির্যা গোলাম আহমাদ 'ই'জাযে আহমাদী' নামে গ্রন্থ লিখে। এই গ্রন্থে সে মাওলানা অমৃতসরীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, তিনি কাদিয়ানে আসুন এবং আমার এলহামগুলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করুন। প্রত্যেক এলহামের বিনিময়ে তাকে একশত রূপী পুরস্কার প্রদান করা হবে। যদি তিনি আমার সকল এলহামকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সফল হন তাহলে ১ লাখ ১৫ হাযার রূপী পুরস্কার পাবার যোগ্য বিবেচিত হবেন।

মির্যার এই চ্যালেঞ্জের জবাবদানের জন্য তিনি ১৯০৩ সালের ১১ই জানুয়ারী (১১ই শাওয়াল ১৩২০ হিঃ) কাদিয়ানে পৌঁছেন এবং মির্যাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানান। কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হয়ে মুহাম্মাদ হাসান আমরূহীর হাতে চিরকুট লিখে পাঠায় যে, কারো সাথে মুনাযারা না করার জন্য সে কসম করে আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। এই চিরকুট পাঠ করে মাওলানা অমৃতসরী কাদিয়ানে বক্তব্য প্রদান করেন এবং মির্যাকে তাঁর নবুওয়াতের দাবীতে মিথ্যুক প্রমাণিত করেন। মাওলানা অমৃতসরীই প্রথম আলেম ছিলেন যিনি মির্যার নবুওয়াত দাবী করার পর কাদিয়ান গিয়েছিলেন এবং কাদিয়ানীদের দুর্গে গিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, 'ই'জাযে আহমাদী' গ্রন্থে মির্যা কাদিয়ানী মাওলানা অমৃতসরীর জ্ঞানগত মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে লিখে যে, মুসলমানদের মধ্যে ছানাউল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা অপরিসীম।

ফাতিহে কাদিয়ান উপাধি লাভ :

মাওলানা অমৃতসরী বিভিন্ন স্থানে কাদিয়ানীদের সাথে মুনাযারা করেছেন, তাদের প্রত্যুত্তরে বইপত্র লিখেছেন এবং মির্যার সাথে বিতর্ক করার জন্য কাদিয়ানেও গিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানেরা তাকে 'ফাতিহে কাদিয়ান'(فاتح قاديان) বা 'কাদিয়ান বিজয়ী' উপাধি প্রদান করেছেন। এই উপাধিটি এত সুন্দরভাবে লিখে তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল যে, ডান ও বাম উভয় দিক থেকে তা সহজেই পড়া যেত।

সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যুকের মৃত্যু :

এখানে এটা উল্লেখ করা যরূরী যে, ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মাওলানা ছানাউল্লাহ ছাহেবের জন্য মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ দো'আ করেছিল যে, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে'। এটাকে মির্যা গোলাম আহমাদের ভবিষ্যদ্বাণী, দো'আ বা বদদো'আ হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটা ছিল তার একক ভবিষ্যদ্বাণী বা দো'আ, যেটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। এর ১১ মাস পর[৪৩] ১৯০৮ সালের ২৬শে মে লাহোরে মির্যার মৃত্যু হয়।

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৮৬৮ সালের জুন মাসে (ছফর ১২৮৫ হিঃ) অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ (৪ঠা জুমাদাল উলা ১৩৬৭ হিঃ) সারগোধাতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ৪০ বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভী (মৃঃ ৬ই নভেম্বর ১৯৫৯ খ্রিঃ) প্রথম আলেম যিনি 'সীরাতে ছানাঈ' নামে মাওলানা অমৃতসরীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মাওলানার মুনাযারার নিম্নোক্ত ১০টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অমৃতসরীর কতিপয় মুনাযারায় সোহদারাভীর নিজেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছিল। প্রত্যেক মুনাযিরের এ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু চিন্তা করাই যথেষ্ট নয়; বরং আমল করা উচিত।

---

৪৩. ১৯০৭ সালের ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে পর্যন্ত ১৩ মাস ১২ দিন পর *(দ্র. মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (লাহোর : মাকতাবায়ে মুহাম্মাদিয়াহ, ২০১১), পৃঃ ১১১-১১৪)*।- অনুবাদক।

১. মাওলানা অমৃতসরী প্রতিপক্ষকে কখনো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা লাঞ্ছিত করতেন না। বরং তাদেরকে সম্মান করতেন এবং সহাস্যবদনে তাদের মুখোমুখি হতেন।

২. সমালোচনা বা প্রত্যুত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দগুলো সর্বদা সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ হত।

৩. সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কেও বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করতে এবং কবিতামালার মাধ্যমে তাতে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তিনি বিশেষভাবে পারঙ্গম ছিলেন।

৪. প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব যেন তাঁর নিকট এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মতো প্রত্যুৎপন্নমতি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৫. কোন বিতর্কে তিনি কখনো ভড়কে যাননি। বরং অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে হেসে হেসে বিতর্ক করতেন।

৬. বিতর্কে সর্বদা তাঁর স্টাইল ছিল আলেমসুলভ বা বিজ্ঞজনোচিত। অবিজ্ঞজনোচিত বা সাধারণ স্টাইল তিনি কখনো বেছে নেননি।

৭. প্রতিপক্ষকে কখনো বিতর্কের বিষয়বস্তুর বাইরে যেতে দিতেন না। বাইরে চলে গেলেও আটঘাট বেঁধে মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনতেন। এটি বিতর্কশিল্পের সৌন্দর্য।

৮. বিতর্কে সর্বদা মুনাযারার মূলনীতিগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মতো বিতর্কের মূলনীতির আলোকেই বিতর্ক করতেন।

৯. খোলা মনে বিতর্কের শর্তগুলো গ্রহণ করতেন। বারংবার প্রতিপক্ষের অন্যায্য শর্তগুলোও মেনে নিতেন। যাতে এই সুযোগে তারা পালানোর পথ খুঁজে নিতে না পারে।

১০. বিতর্কের ময়দানে তথ্যসূত্রবিহীন বা সূত্রের বিপরীতে কোন অভিযোগ আরোপ করেননি বা জবাব প্রদান করেননি। বরং সর্বদা দলীলের আলোকেই বক্তব্য পেশ করেছেন।

এ বৈশিষ্টগুলো মাওলানা অমৃতসরীর মুনাযারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বিতর্কের সময় প্রতিপক্ষ কোন ভুল শব্দ বললে অপরপক্ষের মুনাযির সাধারণত দ্রুত বলে ফেলে, সেতো সঠিক শব্দই বলতে পারে না। মূল শব্দ এরূপ নয়;

বরং এরূপ। মাওলানা হানীফ নাদভী বলেছেন, মাওলানা ছানাউল্লাহ্‌র সামনে প্রতিপক্ষ ভুল শব্দ বললেও না তিনি সেটা শুদ্ধ করে দিতেন, আর না তাকে বাঁধা দিতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদি সে ভুল শব্দ বলে তো বলতে থাকুক। তাকে সঠিক শব্দ বলে দেয়ার আমার কী ঠেকা পড়েছে।

মির্যা কাদিয়ানীকে মিথ্যুক প্রমাণে প্রথম বই :

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ী ছিলেন স্বীয় যুগের একজন সুপরিচিত আহলেহাদীছ আলেম। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা আব্দুল জলীল। যিনি ১৮৫৭ সালের (১২৭৩ হিঃ) স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজদের সাথে জিহাদ করতে করতে আলীগড়ে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে 'মাওলানা আব্দুল জলীল শহীদ' বলা হয়। তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ীর জন্মসন ১২৬৪ হিঃ (১৮৪৮ খ্রিঃ)। প্রচলিত জ্ঞান সমূহে তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৮৯২ সালে (১৩০৯ হিঃ) তিনি 'ই'লাউল হক্ব আছ-ছরীহ ফী তাকযীবি মিছলিল মাসীহ' (إعلاء الحق الصريح في تكذيب مثل المسيح) শিরোনামে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রত্যুত্তরে একটি বই রচনা করেন। ১৮৯১ সালে (১৩০৮ হিঃ) মির্যা নবুওয়াত দাবী করেছিল। এটিই প্রথম গ্রন্থ যেটি তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্নকরণে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৪। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলীগড়ী ১৩১১ হিজরীর ২৭শে শাওয়াল (৩রা মে ১৮৯৪ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

মির্যা কাদিয়ানীর প্রত্যুত্তরে কাযী ছাহেবের গ্রন্থাবলী :

কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরী ১৮৬৭ সালে (১২৮৪ হিঃ) পাটিয়ালা রাজ্যের (পূর্ব পাঞ্জাব) মানছূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং জ্ঞানার্জনের পর উন্নতির পথ পাড়ি দিতে দিতে পাটিয়ালা রাজ্যের সেশন জজের পদে উন্নীত হন। তিনি মির্যা কাদিয়ানীর মাসীহ ও নবী দাবির প্রত্যুত্তরে এবং তার তিনটি গ্রন্থের (ফাতহে ইসলাম, তাওযীহুল মারাম ও ইযালায়ে আওহাম) জবাবে দু'টি গ্রন্থ লিখেন। প্রথম গ্রন্থটির নাম 'গায়াতুল মারাম'। যেটি ১৮৯৩ সালে (১৩১০ হিঃ) প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি ২৪/২৫ বছরের যুবক ছিলেন। এই গ্রন্থটি তাঁর ভাষা দক্ষতা ও ভাবগাম্ভীর্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তায়ীদুল ইসলাম'। যেটি ঐ গ্রন্থের পাঁচ বছর পর ১৮৯৮ সালে (১৩১৬

হিঃ) প্রকাশিত হয়। মির্যা গোলাম আহমাদ সুলাইমান মানছূরপুরীর কোন গ্রন্থের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য মির্যার ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৯৩ সালের ৫ই এপ্রিল ফার্সী ভাষায় তার প্রতি একটি এলহাম হয়েছিল। সেই এলহামটি ছিল 'পুশত বর কেবলা মী কুনান্দ নামায'। কাদিয়ানীদের 'তাযকিরাহ' গ্রন্থের সংকলক লিখছে, কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরীর ব্যাপারে এই এলহাম হয়েছিল যে, তিনি কেবলার দিকে পিঠ করে ছালাত আদায় করেন।[৪৪] সুবহানাল্লাহ! কী এলহাম আর কী ঐ নবীর ভাষা! কাযী ছাহেব ১৯৩০ সালের ৩০শে মে (১লা মুহাররম ১৩৪৯ হিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

মির্যা কাদিয়ানীর সাথে দিল্লীতে প্রথম মুনাযারা :

ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম সাহসোয়ান। যেখানে অসংখ্য আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ইলমী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ঐ সকল উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমদের মধ্যে একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী। যিনি ১২৫২ হিজরীতে (১৮৩৬ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা এবং অনেক বড় বাগ্মী ও মুনাযির ছিলেন। তিনি কোন এক সময়ে ভূপালে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খানের নিকট চলে গিয়েছিলেন। ১৩১২ হিজরীতে (১৮৯৪ খ্রিঃ) তিনি ভূপালে অবস্থানকালে মির্যা কাদিয়ানী দিল্লীতে এসে তার মাসীহ হওয়ার ঢেঁড়া পিটায় এবং মুনাযারার আহ্বান জানায়। ভূপালে মাওলানা বাশীরের নিকট এ খবর পৌঁছে। তিনি দিল্লীতে আসেন এবং এক সভায় মির্যার সাথে আলোচনা হয়। মুনাযারার বিষয় ছিল ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু। মির্যা মৌখিক বিতর্কে অসম্মত হলে লিখিত বাহাছ শুরু হয়। মির্যা তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রথমে তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু যখন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীরের পাকড়াও কঠোর হয় এবং তিনি মাসীহ-এর বেঁচে থাকা সম্পর্কে দলীলাদি পেশ করতে শুরু করেন তখন মির্যা একথা বলে ময়দান ছেড়ে চলে যায় যে, তার 'শ্বশুর' (خُسر)[৪৫] আসছেন। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দিল্লী রেলস্টেশনে তার যাওয়া যরূরী। মাওলানা

৪৪. তাযকিরাহ, পৃঃ ২৬৮।
৪৫. ফার্সীতে 'খুসর' মানে শ্বশুর।-অনুবাদক।

'খুসর' বা 'শ্বশুর' শব্দটি শোনামাত্র কুরআন মাজীদের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ-

'সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(হজ্জ ২২/১১)*।

দিল্লী শহরে এটিই ছিল প্রথম মুনাযারা, যেটি একজন আহলেহাদীছ আলেম মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে করেছিলেন। সম্ভবত এই শহরে এটিই ছিল মির্যার সাথে শেষ মুনাযারা। এই মুনাযারার বিস্তারিত বিবরণ, এর লিখিত পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্ট এবং দিল্লী থেকে মির্যার পলায়ন সবই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ গ্রন্থটির নাম ছিল 'আল-হাক্কুছ ছরীহ ফী ইছবাতি হায়াতিল মাসীহ' (الحق الصريح في إثبات حيات المسيح)। দিল্লীর আনছারী প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল।

মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী ১৯০৮ সালের ২৯শে জুন (২৯শে জুমাদাল উলা ১৩২৬ হিঃ) দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। নিজ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর পাশে শীদীপুরা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা শিয়ালকোটীর ১৭টি গ্রন্থ :

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী আহলেহাদীছ জামা'আতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি প্রায় ৮৪টি গ্রন্থের রচয়িতা, মুফাস্সিরে কুরআন, তেজস্বী বক্তা, অনেক বড় মুহাক্কিক, অত্যধিক অধ্যয়নকারী ও প্রত্যুৎপন্নমতি মুনাযির। কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি ১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪৬] তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম 'শাহাদাতুল কুরআন' (شهادة

৪৬. তাঁর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ৯০টি। এর মধ্যে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে লিখিত হয়েছে ২১টি। এগুলো হল- ১. শাহাদাতুল কুরআন (২ খণ্ড) ২. আনজারুছ ছায়হ আন ক্বাবরিল মাসীহ ৩. খতমে নবুওয়াত আওর মির্যায়ে কাদিয়ান ৪. রাসাইলে ছালাছাহ ৫. নুযূলুল মালাইকাহ ওয়ার রূহ আলাল আরয ৬. মির্যা গোলাম আহমাদ কী বদ কালামিয়াঁ ৭. ফাছ্ছু খাতামিন নবুওয়াহ বিউমূমিদ দাওয়াহ ওয়া জামিইয়্যাতিশ শরী'আহ ৮. মুসাল্লামুল ওয়াছল ইলা আসরারি ইসরাইর রাসূল ৯. ছদায়ে হক ১০-

(القرآن)। যেটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মাওলানা শিয়ালকোটী প্রথম আলেমে দ্বীন যিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ 'শাহাদাতুল কুরআন'-এ কুরআন মাজীদের আলোকে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি কয়েকবার প্রকাশিত ও বহুলপঠিত হয়েছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটী ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে (ছফর ১২৯১ হিঃ) শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালের ১২ই জানুয়ারী (২৮শে জুমাদাল উলা ১৩৭৫ হিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

মুবাহালা ও তার ফলাফল :

মাওলানা আব্দুল হক গযনভী একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছূফী আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁর নিরাসক্ততা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা, ইবাদত ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের কারণে তিনি ছূফী আব্দুল হক উপাধিতে সুপরিচিত ছিলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ গযনভীর সাথে জন্মভূমি গযনী ত্যাগ করে অমৃতসর এসেছিলেন। তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং নতুন নতুন ফিতনা থেকে এর হেফাযতে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। ভিত্তিহীন দাবী এবং মিথ্যা ও ধোঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত মির্যা কাদিয়ানীর চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ লাভের সাথে সাথেই তিনি বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন শুরু করে দিয়েছিলেন। দু'পক্ষের মধ্যে মুকাবিলা চলতে থাকে। বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে মুবাহালা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। মুহাবাহালার জন্য যে পদ্ধতি স্থির হয়েছিল মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ভাষায় তা ছিল এরূপ :

'ঈদগাহ ময়দানে (অমৃতসর) এই পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত শব্দে মুবাহালা হবে। 'আমি অর্থাৎ আব্দুল হক তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলব, হে আল্লাহ! আমি মির্যাকে

---

১১. খিল্লী ছুট্‌টী নম্বর ১, ২ ১২. খতমে নবুওয়াত ১৩. আয়না কাদিয়ানিয়াত ১৪. মুরাক্কা কাদিয়ানী ১৫. ফায়ছালা রব্বানী বর মরগে কাদিয়ানী ১৬. রিহলাতে কাদিয়ানী বামরগে নাগাহানী ১৭. তারদীদে মাফাদাতে মির্যাইয়াহ ১৮. কাদিয়ানী হলফ কী হাকীকাত ১৯. মির্যা কাদিয়ানী কা আখেরী ফায়ছালা ২০. কাশফুল হাকায়িক ইয়া'নী রদ্দাদে মুনাযারাতে কাদিয়ানিয়াহ ২১. কাদিয়ানী মাযহাব মা'আ যামীমা খুলাছা মাসায়েলে কাদিয়ানিয়াহ। দ্র. আব্দুর রশীদ ইরাকী, 'ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়াত কী তারদীদ মেঁ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী (রহঃ) কী খিদমাত', মাসিক 'উসওয়ায়ে হাসানাহ', করাচী, পাকিস্তান, বর্ষ ৬, সংখ্যা ২, ফেব্রুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ১৪-১৫।-অনুবাদক।

পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, কাফের, মিথ্যুক, প্রতারক, কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহকে পরিবর্তনকারী মনে করি। যদি আমি এ কথায় মিথ্যাবাদী হই, তাহলে তুমি আমার উপরে সেরূপ লা'নত করো, যেরূপ তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাফেরের উপরেও করনি'। মির্যা তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বলবে, 'হে আল্লাহ! যদি আমি পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী, কাফের, মিথ্যুক, প্রতারক, কুরআন মাজীদ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহকে পরিবর্তনকারী হই, তাহলে তুমি আমার উপরে সেরূপ লা'নত করো, যেরূপ তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাফেরের উপরেও করনি'। এরপর কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ অনুনয়-বিনয় করে দো'আ করবে যে, হে আল্লাহ! মিথ্যাবাদীকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো। আর উপস্থিত সকলে আমীন বলবে'।[৪৭]

উল্লিখিত ইশতেহার মোতাবেক ১৩১০ হিজরীর ১০ই যিলক্বদ (২৫শে মে ১৮৯৩ খ্রিঃ) অমৃতসরের ঈদগাহে মুবাহালা হয় এবং উভয় পক্ষ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। এই মুবাহালার ফলশ্রুতিতে ১৯০৮ সালের ২৬শে মে (২৫শে রবীউল আখের ১৩২৬ হিঃ) মির্যা গোলাম আহমাদ তার প্রতিপক্ষ (মাওলানা আব্দুল হক গযনভী)-এর জীবদ্দশায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে লাহোরে পায়খানায় পড়ে মারা যায়। উপরন্তু তার মৃত্যুর পর লাহোরের আহমাদিয়া বিল্ডিং থেকে যখন তার লাশ কাদিয়ান নিয়ে যাওয়ার জন্য লাহোর রেলস্টেশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার উপর ইট-পাথর, ময়লা-আবর্জনা, মলমূত্র এমনভাবে বর্ষিত হয় যে, ইতিহাসে কোন নিকৃষ্ট কাফেরেরও এরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননার খবর পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মাওলানা আব্দুল হক গযনভী মির্যার মৃত্যুর পরে পুরা ৯ বছর জীবিত ছিলেন। ১৩৩৫ হিজরীর ২৩শে রজব (১৬ই মে ১৯১৭ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয় এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে দাফন করা হয়।

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পুরা উম্মাতের মধ্যে মাওলানা আব্দুল হক গযনভীই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে মির্যার মুবাহালা হয়। তিনি ব্যতীত অনেক আলেমের সাথে মুবাহালার আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কারো সাথে মুবাহালা হয়নি। মূলত মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে মুবাহালা এবং এতে সফলতা লাভের সৌভাগ্য পুরা উম্মাতের মধ্যে শুধুমাত্র একজন আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ভাগ্যেই জুটেছিল।

---

৪৭. মাওলানা আব্দুল হক গযনভীর ৮ই যিলক্বদ ১৩১০ হিজরীর ইশতেহার-এর বরাতে তারীখে মির্যা (লাহোর : আল-মাকাতাবাতুস সালাফিয়্যাহ), পৃঃ ৪৭।

কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার প্রথম দাবী :

মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী প্রথম আলেম এবং লেখক যিনি সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (লাহোর) পত্রিকায় পাকিস্তান সরকারের নিকট কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবী জানান। এমনকি তিনি কাদিয়ানীদেরকে আহ্বান জানান যে, এখন ইংরেজ শাসনের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করুক যে, পাকিস্তানে যে আইন রচিত হবে সেখানে তাদের স্থান কোথায় হবে এবং নতুন নবীর নতুন উম্মাতের ভবিষ্যৎ কী হবে? এজন্য সরকারের নিকট তাদের নিজেদেরই দাবী করা উচিত যে, সরকার তাদেরকে সংখ্যালঘু আখ্যায়িত করে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায় তাদের হেফাযতের দায়িত্ব নিক। মাওলানা নাদভীর এ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো 'আল-ই'তিছাম'-এর প্রারম্ভিক কাল অর্থাৎ ১৯৪৯-১৯৫১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালে 'মির্যাইয়াত নয়ে ঝাবিউঁ সে' (আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাদিয়ানী মতবাদ) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশনার মুখ দেখে। অতঃপর ২০০১ সালের এপ্রিলে এই গ্রন্থটি নবআঙ্গিকে তারেক একাডেমী, ফায়ছালাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। আমি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছি।

ওলামায়ে কেরাম কাদিয়ানীদেরকে কাফের আখ্যাদান তো করতেনই, কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার পৃষ্ঠাসমূহে তাদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণার প্রথম দাবী করেন। মাওলানা লিখছেন, 'আমাদের মতে খোদ কাদিয়ানীদেরকে একথার উপর জোরাজুরি করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের একটি শাখা বা গোষ্ঠী। তাদের জন্য এটাই যথার্থ যে, তারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে পাকিস্তানে থাকবে। সংখ্যালঘুর এই স্বীকৃতিও তাদের জন্য শুধু একটা কর্তব্যবিধায়ক স্বীকৃতি, অবস্থার বাধ্যবাধকতায় যেটি প্রদান করা হয়েছে। নতুবা নির্ভেজাল ইসলামী কর্মপন্থা হল সেটিই যেটি মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন। এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এজন্য আইন তাদেরকে সকল নাগরিক অধিকার প্রদান করতে এবং তাদেরকে হেফাযত করতে বাধ্য'।[৪৮]

৪৮. মির্যাইয়াত নয়ে ঝাবিউঁ সে, পৃঃ ১২৭।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের আরবী রচনা 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর[৪৯] আহলেহাদীছ জামা'আতের একজন খ্যাতিমান বক্তা ও সেরা লেখক ছিলেন। তিনি 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ' নামে আরবীতে একটি বই লিখেন, যেটি আরব দেশগুলোতে ব্যাপক প্রচার পায় এবং বড় বড় আরব আলেম তা অধ্যয়ন করেন। এর ফার্সী, উর্দূ ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে সবার নাগালে এসেছে। কাদিয়ানী মতবাদের প্রত্যুত্তরে আল্লামার এটি অনেক বড় খিদমত এবং কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের এক আহলেহাদীছ আলেমের এটিই প্রথম আরবী গ্রন্থ। তিনি ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ (২২শে রজব ১৪০৭ হিঃ) ৯ জন সঙ্গীসহ এক বোমা বিস্ফোরণে লাহোরে শহীদ হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে রিয়াদে (সঊদী আরব) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁচেননি। সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং 'বাক্বী' কবরস্থানে (মদীনা মুনাউওয়ারাহ) তাঁকে দাফন করা হয়।

আমাদের বন্ধু ড. বাহাউদ্দীন (মুহাম্মাদ সুলাইমান আযহার) ১২/১৩টি বৃহৎ খণ্ডে 'তাহরীকে খতমে নবুওয়াত' নামে বই লিখেছেন।[৫০] যেগুলোতে কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংকলন করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

কাদিয়ানী মতবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছদের লিখিত অবদানের ইতিহাস কলম থামিয়ে থামিয়ে (সন্তর্পণে) অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হয়েছে এবং আহলেহাদীছদের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব পর্যন্তই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এ বিষয়ের ঐ সকল প্রাথমিক রচনাসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো উর্দূ বা আরবীতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৫৩-এর তাহরীকে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়াত :

১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের সকল ধর্মীয় ও মাযহাবী দলগুলোর পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে 'তাহরীকে তাহাফ্‌ফুযে খতমে নবুওয়াত' বা 'খতমে নবুওয়াত

---

৪৯. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীরের সংগ্রামী জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মে, জুলাই-অক্টোবর ২০১১।-অনুবাদক।

৫০. এ যাবৎ এটির ৪৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গড়ে প্রত্যেকটি খণ্ড পাঁচশত পৃষ্ঠার বেশী। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আলেমদের আপোষহীন ভূমিকা ও সংগ্রামের এটি এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলীল।-অনুবাদক।

সংরক্ষণ আন্দোলন’ শুরু করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে একটি ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে যার সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়েছিল। এই আন্দোলনে অনেক আহলেহাদীছ আলেম গ্রেফতার হন এবং কয়েক মাস যাবৎ দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী থাকেন। তন্মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাতাবী, মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী, মাওলানা আব্দুল্লাহ গুরুদাসপুরী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার, মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখুপুরী, মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমরপুরী, মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী এবং আরো অসংখ্য আলেম শামিল ছিলেন। শুধু চক নং ৩৬, জিবি (যেলা ফায়ছালাবাদ)-এর প্রায় একশত লোক একসাথে গ্রেফতার হন। তাদের মধ্যে শায়খুল হাদীছ হাফেয আহমাদুল্লাহ বাড়হীমালাবীও শামিল ছিলেন। শুধু একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে একসাথে এত লোক গ্রেফতারের ঘটনা একটি রেকর্ড। কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমস্ত লোকজন কয়েক মাস যাবৎ ফায়ছালাবাদ জেলে বন্দী থাকেন। আমাদের গ্রাম চক নম্বর ৫৩, জেবি মানছূরপুরেরও (যেলা ফায়ছালাবাদ) অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই আন্দোলনের পর সরকার বিচারপতি মুহাম্মাদ মুনীর ও বিচারপতি মুহাম্মাদ রুস্তম কিয়ানীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে আলোচনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। মাওলানা গযনভী অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। মাওলানা গযনভীর আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে একদা বিচারপতি কিয়ানী তাঁকে বলেছিলেন, ‘যদি আমার ক্ষমতা থাকত তাহলে আপনাকে ওকালতি করার লাইসেন্স দিয়ে দিতাম’।

১৯৭৪-এর তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত :

১৯৭৪ সালের ‘তাহরীকে তাহাফ্ফুযে খতমে নবুওয়াত’ বা ‘খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ আন্দোলনে’ও অসংখ্য আহলেহাদীছ আলেমকে গ্রেফতার করে দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। গ্রেফতারকৃতদের তালিকায় মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আমজাদ ছাত্তাবী ছাড়াও

অনেক আহলেহাদীছ আলেমের নাম রয়েছে। কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়ার জন্য ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে যে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলো সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণেও আহলেহাদীছ আলেমগণ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফ, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহীম কমরপুরী ও তাদের সাথীগণ অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছেন।

এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যেখানে আহলেহাদীছদের অবদান বিশদভাবে আলোচনা করা উচিত। এখানে তো শুধু সামান্য ইঙ্গিত দেয়া যায় মাত্র। সেটাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। আর তা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমরা কারো সমালোচনা করতে চাচ্ছি না এবং এটা আমাদের কাজও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদানগুলো তুলে ধরা। কারো সাথে মুকাবিলা বা ঝগড়া করা কখনোই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আমাদের এই অভ্যাসও নেই।

৫ম অধ্যায়

উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের অগ্রগণ্য কৃতিত্বের দিকে আসুন!

হিজরী ত্রয়োদশ ও ঈসায়ী ঊনবিংশ শতক উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের যুগ ছিল। যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমানদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দর্শনে চরমভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হন তাঁদের মধ্যে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী, মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী ও তাঁদের সম্মানিত সাথীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সৎ ব্যক্তিগণ সংঘবদ্ধভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। দেশের গ্রাম-গঞ্জে ও শহর-নগরে যান। লোকদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে সুশৃঙ্খলভাবে নিজেদের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

জিহাদ আন্দোলনের উদ্দেশ্য :

তাদের একটি সুশৃঙ্খল আন্দোলন ছিল। যার **একটা উদ্দেশ্য** তো এটা ছিল যে, মুসলমানরা বিদ'আত পরিত্যাগ করবে, পারস্পরিক মেলামেশার সুবাদে তাদের মধ্যে যেসব হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ বাসা বেঁধেছিল তা ছেড়ে দিবে। শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হবে এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। ছালাত-ছিয়াম পালন করবে এবং আক্বীদা ও আমলে কুরআন-সুন্নাহ্র বিধানাবলীকে পথনির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই দেশ থেকে ইংরেজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করা এবং এজন্য যথারীতি জিহাদ করা। এই দু'টি উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। মূলত এজন্য তাঁরা পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান এবং উপমহাদেশে সাড়া ফেলে দেন। এ দেশে দ্বীন পুনর্জীবিতকরণের এটিই ছিল প্রথম নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। যার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জিহাদের আহ্বান জানিয়ে ভিনদেশী কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা নিজ জন্মভূমিকে বিদায় জানান এবং আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করে নিজেদেরকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুছীবতের নিকট সোপর্দ করেন। জিহাদী জোশে

পাগলপারা হয়ে ঐ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সানন্দে নিজেদের বাড়ি থেকে যাত্রা করেন এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোকে নিজেদের কেন্দ্র নির্বাচন করেন। যেগুলো ইংরেজদের নাগাল ও অমুসলিমদের কর্তৃত্বের বাইরে ছিল।

১২৪১ হিজরীর ৭ই জুমাদাল আখেরাহ (১৭ই জানুয়ারী ১৮২৬ খ্রিঃ) আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদ আহমাদ শহীদের নেতৃত্বে পাঁচ/ছয়শো জন মুজাহিদের প্রথম কাফেলা যাত্রা শুরু করে।[৫১] তাঁদের নিকট নগদ সর্বমোট পাঁচ হাযার রূপী ছিল। যাকে পাথেয় বলা চলে। শিখ সরকারের কারণে পাঞ্জাব অতিক্রম করা কঠিন ছিল। এজন্য তাঁরা রাজস্থান হয়ে সিন্ধুতে পৌঁছেন। সেখান থেকে কান্দাহার অতঃপর কাবুল যান। কাবুল থেকে রওয়ানা হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশ করেন এবং স্বাধীন গোত্রগুলোকে নিজেদের অবস্থানস্থল হিসাবে বেছে নেন। এরপর উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মুজাহিদ সেখান পৌঁছতে শুরু করেন।

স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদের এই কাফেলা স্বাধীন কেন্দ্রে পদার্পণ করা মাত্রই শিখ সৈন্যরা মুকাবিলার জন্য বের হয়ে আসে এবং যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। এটি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা। মূলত নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখা এবং বিজিত এলাকাগুলোকে বিন্যস্ত করার জন্য একটি সুশৃঙ্খল সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্য ১২৪২ হিজরীর ১২ই জুমাদাল আখেরাহ (১০ই জানুয়ারী ১৮২৭ খ্রিঃ) একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এই সরকারের আমীর নিযুক্ত হন। সাইয়িদ ছাহেবের ভারতীয় সাথীগণ ছাড়াও স্থানীয় পাঠানরা তাঁর নিকট বায়'আত করে এবং তাঁর নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়।

সাইয়িদ ছাহেবের সাথীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন আলেম-ওলামা। জিহাদের নেতৃত্বের লাগাম তাঁদের হাতেই ছিল। আলেমগণের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, মাওলানা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কন্নৌজী, মাওলানা বেলায়াত আলী আযীমাবাদী,

---

৫১. অগ্রগামী বাহিনী, দক্ষিণ বাহু, বামবাহু, রসদবাহী দল ও মূল বাহিনী সহ পাঁচটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আমীরের দায়িত্বে সোপর্দ করে সাইয়িদ আহমাদের জন্মস্থান অযোধ্যার রায়বেরেলীর 'তাকিয়া' গ্রাম হতে মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয় *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ২৬৩)*।-অনুবাদক।

মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আলী রামপুরী অন্যতম। মোটকথা অনেক আলেম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এই জামা'আতে শামিল ছিলেন। যারা স্রেফ আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণ এবং দেশ থেকে ইংরেজদের আধিপত্য খতম করার জন্যই ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, শিখরা তাদের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে এবং তাদের সাথে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি কঠিন যুদ্ধ হয়। শেষ মুকাবিলা হয়েছিল বালাকোট ময়দানে। যেখানে ১২৪৬ হিজরীর ২৪শে যিলক্বদ (৬ই মে ১৮৩১ খ্রিঃ) সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল দেহলভী সহ শতশত মুজাহিদ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।[৫২]

যাহোক শিখ বা ইংরেজ যাদের সাথেই লড়াই হোক তাতে কোন যায় আসে না। দু'টি দলই মুসলমানদের শত্রু ছিল এবং উভয়েরই লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। বালাকোট যুদ্ধের পর মুজাহিদগণ যথারীতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হন। মুজাহিদগণের এই আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক ও নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন ছিল। প্রায় সোয়াশো বছর ব্যাপী (১৮২৬-১৯৪৭ খ্রিঃ) যেটি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল এবং অবশেষে সেই শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

শাহ আব্দুল আযীয-এর ফৎওয়া :

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক ইংরেজদের বিরুদ্ধে জারীকৃত ফৎওয়াই ছিল জিহাদ আন্দোলনের ভিত্তি। ফৎওয়াটি ফার্সী ভাষায় জারী করা হয়েছিল। যার অনুবাদ নিম্নরূপ- 'এখানে খ্রিস্টান নেতাদের (খ্রিস্টান শাসকদের) হুকুম নির্দ্বিধায় জারী আছে। আর তাদের হুকুম জারী ও কার্যকরী হওয়ার মানে হল রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রজা পালন, খারাজ ও কর, ওশর ও ভূমিকর, ব্যবসায়িক সম্পদ, চোর-ডাকাতদের মামলা-মোকদ্দমার বিচার এবং অপরাধ সমূহের শাস্তি প্রদানে এই লোকেরা (খ্রিস্টানরা) নিজেরাই হাকিম (বিচারক) ও একচ্ছত্র অধিপতি। জুম'আর ছালাত, ঈদায়েন, আযান এবং গাভী যবেহ ইত্যাদি বিধি-বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু যে জিনিসটা এ সকল কিছুর মূল এবং স্বাধীনতার ভিত্তি তা নিশ্চিতভাবে

---

৫২. এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং ৭০০ শিখ সৈন্য নিহত হয় *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ২৮৪)*।-অনুবাদক।

ভূলণ্ঠিত ও পদদলিত। এরা নির্বিচারে মসজিদগুলিকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে। এমনকি কোন মুসলিম বা অমুসলিম তাদের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত এই শহর (দিল্লী) বা এর আশপাশে আসতে পারে না। সাধারণ মুসাফির বা ব্যবসায়ীদের শহরে যাতায়াতের যে অনুমতি রয়েছে সেটিও দেশীয় স্বার্থ বা জনসাধারণের নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের নিজেদের স্বার্থে। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ তাদের অনুমতি ব্যতীত এই দেশে প্রবেশ করতে পারে না। দিল্লী থেকে কলকাতা অবধি তাদেরই কর্তৃত্ব চলছে। অবশ্য কিছু ডানে-বামে যেমন হায়দারাবাদ, লাক্ষ্ণৌ ও রামপুরের শাসকদের ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করা মানে যথারীতি খ্রিস্টানদের শাসন জারী হওয়া নয়'।[৫৩]

এটা ছাড়াও শাহ আব্দুল আযীয আরেকটি ফৎওয়া জারী করেছিলেন। যেটিতে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে 'দারুল হারব' বা যুদ্ধ এলাকা হয়ে গেছে।[৫৪]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এ দু'টি ফৎওয়াই সুস্পষ্ট। এর আলোকে নিঃসন্দেহে ঐ সময় ভারতবর্ষ 'দারুল হারব' ছিল এবং এর স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সাথে জিহাদ করা আবশ্যক ছিল। মূলত মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং তাঁদের সাথীগণ ইংরেজদের সাথে জিহাদের সূচনা করেছিলেন। অতঃপর কোন না কোনভাবে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতে থাকতে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার নে'মত লাভ সহজসাধ্য হয়। মুজাহিদগণের এই আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেটি ১২১ বছর যাবৎ চলমান ছিল।

বাংলার ফারায়েযী আন্দোলন :

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভীর আন্দোলনের কয়েক বছর পূর্বে 'ফারায়েযী' নামে বাংলাদেশে একটি জামা'আত বা দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা শরীয়তুল্লাহ। যিনি ফরীদপুর যেলার বাহাদুরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে হজ্জ পালন করতে যান এবং ২০ বছর মক্কা

---

৫৩. ফাতাওয়া আযীযিয়া ১/১৭।
৫৪. ঐ ১/১০৫।

মু'আযযামায় অবস্থান করে শায়খ তাহের মাক্কী শাফেঈর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮০২ সালে তিনি ভারতে আসেন। ১৮০৪ সালে তিনি 'ফারায়েযী জামা'আত' নামে বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং মন্দ রসম-রেওয়াজ ও বিদ'আত উৎখাতের আন্দোলন শুরু করেন। মাওলানা শরীয়তুল্লাহ প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর আন্দোলনও জিহাদ আন্দোলনের ন্যায় ওহাবী আন্দোলন-এর নামে পরিচিত হয়। ফারায়েযী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষভাবে কৃষক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে অনেক কাজ করেন। তিনি 'পীর-মুরীদ' এর পরিবর্তে 'উস্তাদ-শাগরেদ' শব্দগুলি ব্যবহার করতেন। তাঁর শ্লোগান ছিল ভূমি আল্লাহ্‌র (اَلْأَرْضُ لِلّٰهِ) এবং যে ব্যক্তি জমিতে কাজ করে, সেই তার মালিক। ১৮৪০ সালে মাওলানা শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে হাজী মুহসিন মিয়াঁ ফারায়েযী আন্দোলনের নেতৃত্ব সামলান। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানেরা তাঁকে আদর করে 'দুদু মিয়াঁ' বলে ডাকত। পিতার মতো তিনিও উদ্যমী ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করাও ফারায়েযী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তারা বহু ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইংরেজদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করেন।

নিছার আলী ওরফে তিতুমীর :

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভী ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ দেহলভী যেই সময় স্বাধীন গোত্রগুলোতে জিহাদী কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে বাংলায় নিছার আলী নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। যিনি 'তিতুমীর' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি কৃষক ছিলেন। এক জমিদার বাড়িতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর শিষ্য ছিলেন। তিতুমীর ছিলেন কৃষকদের রক্ষক। হাযার হাযার কৃষক তাঁর সাথে ছিল। যারা হিন্দু জমিদারদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফারায়েযী আন্দোলন ছিল বাংলার মুসলমানদের প্রথম আন্দোলন। ওখানকার অবস্থা অনুযায়ী ঐ সময়ের আহলেহাদীছ আলেমগণ একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার আলোকে যার গোড়াপত্তন করেছিলেন।

১৮৩১ সালে কৃষ্ণরায় নামে পূর্ণিয়ার এক জমিদারের কথা লোক জানতে পারে। তিনি এই যুলুম করেন যে, তার প্রত্যেক মুসলিম কৃষকের উপর, যাকে তিনি ওহাবী বলতেন, আড়াই টাকা ট্যাক্স ধার্য করতেন। তিনি এটাকে 'দাড়ির ট্যাক্স' হিসাবে আদায় করে মুসলমানদের ক্রোধাগ্নি জ্বালিয়ে দেন।[৫৫] নিজ গ্রামে বিনা বাধায় তিনি এই ট্যাক্স আদায় করে নেন। কিন্তু যখন তার কর্মচারীরা নিকটবর্তী গ্রাম সরফরাজপুরে পৌঁছে তখন ঘটনাচক্রে সেখানে নিছার আলী তিতুমীর স্বীয় ভক্তদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণরায়ের কর্মচারীদেরকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে কঠিন সংঘর্ষ হয় এবং ঘটনা নিহত হওয়া পর্যন্ত গড়ায়। এতে তিতুমীর ও তাঁর অনেক সাথী শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।[৫৬]

---

৫৫. তিতুমীরের সহযোদ্ধা সাজন গাযী 'তিতুমীরের গান'-এ এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'নামাজ পড়ে দিবারাতি/কি তোমার করিল খেতি/কেনে কল্লে দাড়ির জরিমানা' *(উদ্ধৃত : দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৭), পৃঃ ৮৯)*।-অনুবাদক।

৫৬. ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর সঙ্গী-সাথীসহ নিছার আলী তিতুমীর নারিকেলবাড়িয়ার ঐতিহাসিক 'বাঁশের কেল্লা'-র যুদ্ধে ছালাতরত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। সেনাপতি গোলাম মা'ছূমসহ বাকী সাড়ে তিনশত সাথী গ্রেফতার বরণ করেন *(দ্র. গোলাম রাসূল মেহের, সারগুযাশতে মুজাহিদীন, পৃঃ ২০৪-২০৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৮)*। ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান ব্রিটিশ সূত্রের আলোকে উল্লেখ করেছেন যে, এদের মধ্যে ৩৩৩ জনকে ১৮৩৩ সালের ২২শে নভেম্বরে আলীপুর জেল সুপারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অবশিষ্ট ১৭ বা ২০ জনকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নদীপথে পাঠানো হয়। বন্দীদের মধ্যে ১৯৭ জনকে ৫টি মামলায় জড়ানো হয়। এদের মধ্যে ৪ জন বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উন্মাদ অবস্থায় ১ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। তাছাড়া কমিটি ৩ জনকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে। মোট ১৮৯ জন বন্দীর বিচার কোর্ট সমাধা করে। এদের মধ্যে ৪৯ জনকে কোর্ট নির্দোষ এবং অবশিষ্ট ১৪০ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। ১৪০ জনের মধ্যে তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি গোলাম মা'ছূমকে (৩০) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর অন্যদের জন্য সতর্কবার্তা হিসাবে তাঁর লাশ নারিকেলবাড়িয়ায় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া অন্য ৩ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেও কোন সাজা প্রদান করা হয়নি। অবশিষ্ট ১৩৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জনকে যাবজ্জীবন, ৯ জনকে ৭ বছর কারাদণ্ড, ৯ জনকে ৬ বছর, ১৬ জনকে ৫ বছর, ৩৫ জনকে ৪ বছর, ৩৪ জনকে ৩ বছর এবং ২২ জনকে (সর্বমোট ১৩৬) ২ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দ্র. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ (Titumir and his followers in British Indian Records) অনুবাদ : ড.

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আহলেহাদীছ আলেমদের অবদান :

১৮৫৭ সালের (১২৭৩ হিঃ) স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তাতেও আহলেহাদীছগণ অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য জারী করা ফৎওয়ায় মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী স্বাক্ষর করেছিলেন।[৫৭] ফৎওয়া জারির কিছুদিন পর মিয়াঁ ছাহেবকে দিল্লী থেকে গ্রেফতার করে সেখান থেকে ১২/১৩ শত কিলোমিটার দূরে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে বন্দী করা হয়। মিয়াঁ ছাহেব ১ বছর কারাবন্দী থাকেন।[৫৮] এই যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় হলে তারা অসংখ্য

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া *(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃঃ ৩৬-৩৮)*।-অনুবাদক।

৫৭. ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জিহাদ আখ্যা দিয়ে যে ফৎওয়া জারী করা হয়েছিল তাতে মোট ১৪ জন আলেম স্বাক্ষর করেছিলেন। এদের মধ্যে মিয়াঁ ছাহেবের নাম ছিল সর্বাগ্রে। ঐ আলেমগণের তালিকা 'যাফরুল আখবার' ও 'ছাদিকুল আখবার' নামে তদানীন্তন দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া ১৮৫৭'র মহাবিপ্লবের সেনাপতি জেনারেল বখত খাঁও আহলেহাদীছ ছিলেন *(দ্র. আব্দুর রশীদ ইরাকী, হায়াতে নাযীর (লাহোর : নাশরিয়াত, ২০০৭), পৃঃ ৬৬)*।-অনুবাদক।

৫৮. মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর বিরুদ্ধে বিরোধীরা ইংরেজ সরকারের নিকট অভিযোগ করে যে, তাঁর নিকটে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পত্র আসে। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর বাড়ি তল্লাশি করা হলে অনেক পত্র পাওয়া যায়। যেগুলো কোন মাসআলা জানার জন্য বা ধর্মীয় পুস্তকের সন্ধান জানার জন্য তাঁর নিকটে প্রেরিত হয়েছিল। মিয়াঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার নিকটে এত পত্র আসে কেন? তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দেন, এই প্রশ্ন পত্র প্রেরকদেরকে করা উচিত, আমাকে নয়? উদ্ধারকৃত পত্রগুলির মাঝে একটিতে লেখা ছিল, 'নুখবাতুল ফিকার' (نخبة الفكر) পাঠাবেন। গোয়েন্দা বলে যে, এটি একটি বিশেষ পরিভাষা। যার মর্ম অন্য কিছু। এরা পত্রে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে। মিয়াঁ ছাহেব এই কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, নুখবাতুল ফিকার কি কামান, বন্দুক, না গোলা-বারুদ? অতঃপর তিনি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, জনাব আপনি আমার মামলা কোন মূর্খের সামনে পেশ করেছেন। আপনি আপনার কোন ইউরোপীয় বা দেশীয় আলেমকে জিজ্ঞেস করুন যে, 'নুখবাতুল ফিকার' কোন বইয়ের নাম কি-না? এরপর তাকে দিল্লী থেকে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানকার জেলে তিনি এক বছর বন্দী থাকেন। জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায় মিয়াঁ ছাহেব সরকারী লাইব্রেরী থেকে বইপত্র পড়ার অনুমতি নেন। অধ্যয়নেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত। মিয়াঁ ছাহেবকে ফাঁসানোর অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাযির করতে না পেরে ১ বছর পর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় *(দ্র. হায়াতে নাযীর, পৃঃ ৬৩-৬৫; মাওলানা ফযল হুসাইন, আল-হায়াত বা'দাল মামাত (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৪), পৃঃ ৯৮-৯৯)*।-অনুবাদক।

মুসলমানকে গ্রেফতার করে ফাঁসি প্রদান করে অথবা লবণাক্ত সমুদ্র পার হওয়ার শাস্তি দেয় অর্থাৎ কালাপানিতে নির্বাসন দেয়। এদের মধ্যে অনেক ওহাবী ছিল।

এরপর ওহাবীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা সমূহ দায়ের করা হয়। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেগুলোকে 'ওহাবী মোকদ্দমা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আম্বালা, আযীমাবাদ (পাটনা), মালদহ, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মোট ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সংক্ষেপে ঐ সমস্ত মামলার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আম্বালার প্রথম বিদ্রোহ মামলা :

আম্বালায় শুরু হওয়ার কারণে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই মোকদ্দমাটিকে 'আম্বালা মোকদ্দমা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এটি ছিল প্রথম রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা। মামলার প্রাথমিক কার্যক্রম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টাই-এর আদালতে শুরু হয়েছিল। যেটি এক সপ্তাহ অব্যাহত ছিল। এই সময়ে অভিযোগের ধরন, সাক্ষীদের বিন্যস্তকরণ এবং সাক্ষ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ একত্রিত করে সব অভিযুক্তকে সেশন কোর্টে সোপর্দ করে দেয়া হয়। যথারীতি সেশন আদালতে মামলা শুরু হয়। এরা ১১ জন আসামী ছিলেন। যাদের নাম পরে উল্লেখ করা হবে।

প্রথম দিন ডেপুটি কমিশনারের আদালতে অভিযুক্তদের হাযির করা হলে মোকদ্দমা চলাকালীন ছালাতের সময় হয়ে যায়। ছালাত আদায়ের অনুমতি চাইলে অনুমতি মিলেনি। অতঃপর এই রীতি হয়ে দাঁড়ায় যে, যখনই ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে যেত তখনই অভিযুক্তরা তায়াম্মুম করে বসে ইশারায় ছালাত আদায় করে নিতেন। ডেপুটি কমিশনারের আদালতে যতদিন মামলার শুনানি চলে ততদিন প্রত্যেক আসামী পৃথক পৃথক ফাঁসির কক্ষে বন্দী থাকেন। যখন মামলা সেশন কোর্টে স্থানান্তরিত হয় তখন সবাইকে জেলখানায় এক জায়গায় রাখা হয়। এখানে পরিবেশ কিছুটা অনুকূলে ছিল এবং সবাই একত্রে থাকতেন। এজন্য কষ্টের অনুভূতি প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। ঐ দিনগুলিতে মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী প্রায়শই এই ফার্সী কবিতা পাঠ করতেন,

پائے در زنجیر پیش دوستاں * بہ کہ بہ بیگانگاں در بوستاں

‘বন্ধুদের সাথে পায়ে যিঞ্জীর পরিহিত থাকা অপরিচিতদের সাথে বাগিচায় থাকার চেয়েও উত্তম’।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী কষ্টের সেই দিনগুলিতে সাধারণভাবে এই চতুষ্পদী কবিতা পড়তেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন-

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

‘আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে’। ‘আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন’।[৫৯]

অপরাধীদের নাম ও রায় :

আমরা এখানে এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে চাচ্ছি না। এখানে শুধু এটা বলা উদ্দেশ্য যে, সেশন জজের আদালতে মামলা চলে। কতিপয় আসামী বড় অংকের ফিস দিয়ে ইংরেজ উকিলদের সহায়তা নেন। কিন্তু আদালত ১৮৬৪ সালের ২রা মে নিম্নোক্ত আসামীদেরকে নিম্নলিখিত রায় শুনায় :

১. **শেখ মুহাম্মাদ শফী :** মৃত্যুদণ্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত, জেলের কবরস্থানে লাশ দাফন করা হবে।

২. **মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ছাদেকপুরী :** একই সাজা।

৩. **মাওলানা মুহাম্মাদ জা‘ফর থানেশ্বরী :** মৃত্যুদণ্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত।

৪. **মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী :** কালাপানিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত।

৫. **কাযী মিয়াঁজান**[৬০] **:** একই সাজা।

---

৫৯. সীরাত ইবনে হিশাম ২/১৭৬; বুখারী হা/৩৯৮৯।

৬০. ব্যাপক ওহাবী ধরপাকড়ের সময় যে পাঁচজন সেরা মুজাহিদ আমৃত্যু সকল নির্যাতনের মুখে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালীর দুর্গাপুর কাযীপাড়ার বীর সন্তান কাযী মিয়াঁজান। ১২৮১ হিঃ মোতাবেক

৬. **আব্দুল গাফফার ছাদেকপুরী :** একই সাজা।

৭. **মুনশী আব্দুল করীম :** একই সাজা।

৮. **এলাহী বখশ :** একই সাজা।

৯. **আব্দুল গফুর :** একই সাজা।

১০. **হুসায়নী আযীমাবাদী :** একই সাজা।

১১. **হুসায়নী থানেশ্বরী :** একই সাজা।

সাজা শোনার পর আসামীদের ইংরেজ এ্যাডভোকেটগণ পাঞ্জাব জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে আপিল করেন। যার ফলে সাজা কিছুটা হাল্কা হয় এবং প্রথম তিন আসামীর মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসনে রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৬৪ সালের ২৪শে আগস্ট এই রায় দেয়া হয়। যে তিনজন বুযুর্গের ফাঁসির সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত হয় তার সংবাদ তারা ১৮৬৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর অবগত হন।

যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে যে, শেখ মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফরকে (তিনজন) ফাঁসির সাজা শুনানো হয়েছিল। এখানে এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী সাজা শুনে দারুণ খুশি ছিলেন। ইংরেজ পুলিশ অফিসার মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফরকে এই খুশির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, 'শাহাদাতের আকাঙ্খায় খুশি হয়েছি। যেটি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। তুমি এর মর্ম কী বুঝবে'?[৬১]

এরপর তাঁদের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়। কারণ এতে আসামীরা আনন্দ অনুভব করছিল। আর তাদেরকে খুশি করা কস্মিনকালেও উদ্দেশ্য ছিল না।[৬২]

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলখানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২২)*।-অনুবাদক।

৬১. মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী, কালাপানি, পৃঃ ৬৮।

৬২. হান্টারের মতে, মুজাহিদগণকে শাহাদাতের অমৃতসুধা হতে বঞ্চিত করার জন্য কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর ছিল ইংরেজ বিচারকদের একটি সূক্ষ্ম পলিসি। যাতে তারা জিহাদে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে *(দ্র. দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ৮৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২)*।-অনুবাদক।

এর পরিবর্তে কালাপানিতে নির্বাসন সহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কারণ মৃত্যুর পরিবর্তে এটি বেশি কষ্টদায়ক শাস্তি হবে। শেখ মুহাম্মাদ শফীর সাজা শুধু সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা দেয়া হয়েছিল তাদের মাথা ও দাড়ি-মোচ কামিয়ে দেয়া হয়েছিল। মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী কর্তিত দাড়ি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বলতেন, 'দুঃখ করিস না। তোকে আল্লাহ্র রাস্তায় গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এজন্যই কর্তন করা হয়েছে'।[৬৩]

কালাপানিতে যাত্রা :

উপরোক্ত ১১জন আসামীর মধ্যে চারজন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মিয়াঁ আব্দুল গাফফার, মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মাওলানা আব্দুর রহীমকে কালাপানিতে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম তিনজন বুযুর্গকে হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়ে পায়ে হাটিয়ে আম্বালা থেকে লুধিয়ানা, ফলওয়ার, জলন্ধর ও অমৃতসর হয়ে লাহোর নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছুদিন লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। এরপর ট্রেন যোগে মুলতান এবং সেখান থেকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে কোটরী পৌঁছানো হয়। কোটরী থেকে করাচী এবং করাচী থেকে পাল তোলা নৌকায় করে মুম্বাই পৌঁছে। ১৮৬৪ সালের ৮ই ডিসেম্বর জমুনা সামুদ্রিক জাহাজে মুম্বাই থেকে যাত্রা করে ৩৪ দিন পর ১৮৬৫ সালের ১১ই জানুয়ারী পোর্ট ব্লেয়ারে (আন্দামান দ্বীপ) অবতরণ করে।[৬৪]

এর কিছুদিন পর মাওলানা আব্দুর রহীমকে আম্বালা জেল থেকে বের করা হয়। তিনি অসুস্থ ছিলেন। লাহোর পৌঁছার পর ১ বছর ৮ মাস লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকেন। এরপর মুলতান, কোটরী, করাচী ও মুম্বাই হয়ে কালাপানি পৌঁছেন। তাঁর এই সফর খুবই কষ্টদায়ক ছিল। এর একটা কারণ

---

৬৩. কালাপানি, পৃঃ ৬৮।

৬৪. উপরোক্ত বর্ণনায় ১৮৬৪ সনের স্থলে ১৮৬৫ এবং ১৮৬৫ সনের স্থলে ১৮৬৬ হবে। দ্র. ড. কিয়ামুদ্দীন আহমাদ, হিন্দুস্তান মেঁ ওয়াহাবী তাহরীক *(The Wahabi Movement in India), উর্দূ অনুবাদ : প্রফেসর মুহাম্মাদ মুসলিম আযীমাবাদী (করাচী, পাকিস্তান: নাফীস একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮০), পৃঃ ২৭৪; Ritu Chaturvedi and S.R. Bakshi, Bihar through the Ages, Vol. 3 (New Delhi : Sarup & sons, 2007), p. 313)*.-অনুবাদক।

তো এটা ছিল যে, তিনি নিজে অসুস্থ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল যে জাহাজে তিনি যাত্রী ছিলেন, তার সকল যাত্রী বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছিল। যার কারণে জাহাজটি ২৩ দিনের পরিবর্তে ১ মাস ২১ দিনে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছেছিল।

২. আযীমাবাদের প্রথম বিদ্রোহ মামলা :

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী প্রমুখের মামলার রায় হওয়ার পর- যেটি আসলে প্রথম বিদ্রোহ মামলা ছিল- আযীমাবাদে (পাটনা) মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ধারাবাহিকতার দিক থেকে এটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ছিল। কিন্তু আযীমাবাদের (পাটনা) দু'টি মামলার মধ্যে প্রথম ছিল।

নিজের জ্ঞান-গরিমা, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা, ইবাদত-বন্দেগী এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে মাওলানা আহমাদুল্লাহ আযীমাবাদ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি ছিলেন মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর বড় ভাই, নিজ এলাকার নেতা এবং মৌলবী এলাহী বখশ জা'ফরীর পুত্র। তিনি ১২২৩ হিজরীতে (১৮০৮ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাম রেখেছিলেন আহমাদ বখশ। সাইয়িদ আহমাদ শহীদের সাথে জড়িত হলে তিনি তাঁর নাম রাখেন আহমাদুল্লাহ। অতঃপর এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী ও অন্যান্য শিক্ষকগণের নিকট দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেন। ১৮৫৭ সালের গণ্ডগোলের সময় প্রায় তিন মাস সার্কিট হাউসে নযরবন্দী থাকেন।

আযীমাবাদের এই গোটা পরিবারকে ইংরেজ সরকার বিপদের সম্মুখীন করেছিল এবং পরিবারের সব সদস্যের বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছেলে হাকীম আব্দুল হামীদ 'শাহরে আশূব' (গণ্ডগোলের মাস) নামে ফার্সীতে একটি মছনবী লিখেছিলেন। যেখানে ঐ সকল কষ্ট-পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছিলেন। এই মছনবীতে মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর উক্ত সাজার কথাও মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ১ বছর পূর্বে যে সাজা আম্বালায় প্রদান করা হয়েছিল।

১২৮১ হিজরীর ২৯শে রামাযানে (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ খ্রিঃ) মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র সাজার হুকুম জারী করা হয়েছিল। প্রথমে সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও ফাঁসির সাজা শুনানো হয়েছিল। পরে এটাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালিপানিতে নির্বাসনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাঁসির দণ্ডাদেশে মাওলানা মোটেই বিচলিত হননি। ছোট ভাই মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলীর মতোই তিনিও সাজা শুনে আনন্দিত ও প্রফুল্ল ছিলেন।

সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও নিলাম :

সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের কারণে তাঁদের কোন চিন্তা ছিল না। এ জাতীয় সকল কষ্ট তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করতে পারতেন। আসল চিন্তা ও কষ্ট ছিল পরিবার-পরিজনকে নিয়ে। সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের কারণে যারা বাস্তুহারা হয়ে গিয়েছিলেন এবং মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই তাদের ছিল না। দিন গুযরানের ছিল না কোন ব্যবস্থা। তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি নিলামের প্রশ্ন সামনে আসলে আযীমাবাদের (পাটনা) মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে উক্ত ডাকে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। সেজন্য প্রতিশোধ পরায়ণতায় উন্মত্ত হয়ে ইংরেজরা লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেয়। নিলামের ৭৭ বছর পর ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়া এ্যাক্টের অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বিহার প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে ১৯৩৯ সালে হাজীপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মিঃ বদরুল হাসান বিহার এ্যাসেম্বেলীতে ঐ সম্পদের মূল্য ও নিলাম সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে সরকারের একজন মন্ত্রী ঐ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। যা ১২৮১ হিজরীর রামাযান মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ খ্রিঃ) ইংরেজরা বাযেয়াফ্ত করেছিল।

এখানে এটা খোলাছা করা আবশ্যক যে, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ঐ তিন ভাইয়ের (মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ) বইপত্র, আসবাবপত্র, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, পালকি, অলংকার প্রভৃতি বহু মূল্যবান সামগ্রী শামিল ছিল। যেগুলো খুবই কম মূল্যে নিলাম হয়েছিল। এরপর তাঁদের বাড়ি-ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের মহল্লা ছাদেকপুরকে আযীমাবাদ (পাটনা) পৌরসভা কমিটিকে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ঐ স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল যাকে 'কাফেলা' বলা হত। সেটিকে এজন্য 'কাফেলা' বলা হত যে,

ওখানে মুজাহিদগণ এবং ঐ জামা'আতের সদস্যগণ অবস্থান করতেন। এই পুরো জায়গায় পাটনা পৌরসভা কমিটির ভবন নির্মিত হয়।[৬৫]

নারী ও শিশুদের সঙ্গীন অবস্থা :

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র পরিবার-পরিজনকে ঈদের দিন তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। নারী-শিশু নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে ছিল। থাকার জন্য ছিল না কোন স্থান এবং ব্যবহারের জন্য ছিল না কোন আসবাবপত্র। একটি সুখী পরিবার চরম অসহায়ত্বের শিকার হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র ছেলে হাকীম আব্দুল হামীদ- যিনি অত্যন্ত যোগ্য আলেম ও কবি ছিলেন, 'শাহরে আশূব' মছনবীতে বিস্তারিতভাবে এটি উল্লেখ করেছেন।

উক্ত মছনবীর কতিপয় পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ :

'যখন ঈদের রাত শেষ হল এবং আমাদের পরিবার-পরিজন সকাল বেলায় উপনীত হল, তখন সবাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হল। সকল সহায়-সম্পদ বাযেয়াফ্ত ও উজাড় হল। নগদ অর্থ, শস্য, আসবাবপত্র, কৃষিক্ষেত সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেল। আমাদের জন্য আহ্ বলাটাও কঠিন অপরাধ ছিল। আসবাবপত্রের মধ্যে সুঁই পর্যন্ত তুলে নেওয়ার অনুমতি ছিল না। আমি একা ছিলাম না, আমার সাথে অনেক মানুষও ছিল। ছিল নারী-শিশু ও তাদের আর্তনাদ। সরকারের দৃষ্টিতে অপরাধী ছিলেন আহমাদুল্লাহ। কিন্তু নিষ্পাপ শিশুদের কী অপরাধ ছিল? আমাদের জীবনের পুঁজি মৃত্যুর আসবাব হয়ে গিয়েছিল। ... আমাদের ঈদ মুহাররমের চাঁদ হয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম জীবন্মৃত। আমার জন্য প্রশস্ত যমীন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল'।

---

৬৫. ১৮৬৪ সালে বৃটিশ সরকার ছাদিকপুরী পরিবারের উপরে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার, তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করা ছাড়াও সমস্ত ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভিটা উচ্ছেদ করে সেখানে লাঙল চালানো হয়। মাওলানা ফারহাত হুসাইনসহ ছাদিকপুরী পরিবারের বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরস্থান সমান করে সেখানে হিন্দু হরিজনদের শূকর পোষার আখড়া এবং শহরের পায়খানা ফেলার গাড়ী রাখার জায়গা বানানো হয়। কিছু অংশে মহিলাদের মীনাবাজার বসানো হয়। বাকী অংশে পৌরসভার বিল্ডিংসমূহ নির্মিত হয়েছে *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১৪; 'আমীরে জামা'আতের ভারত সফর', আত-তাহরীক, জুলাই '৯৮, পৃঃ ৫২)*।-অনুবাদক।

মছনবী লেখক হাকীম আব্দুল হামীদ চিকিৎসা করতেন এবং তাঁর সুন্দর দাওয়াখানা ছিল। সেটাও সরকার ক্রোক করে নিয়েছিল। অর্থাৎ জীবনযাপনের কোন কিছুই তাঁর নিকট অবশিষ্ট রাখেনি। বইপত্র, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি কোন কিছুই তাঁর আয়ত্তে ছিল না। বইপত্র জব্দ করার কারণে তিনি বিশেষভাবে অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি বলছেন-

کتب ملت مسلماناں * رفت در دست حرف ناخواناں

'মুসলমানদের ধর্মীয় বইপুস্তক মূর্খ লোকদের হাতে চলে গিয়েছিল'।

মাওলানা আহমাদুল্লাহকে কালিপানিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কখন আযীমাবাদ (পাটনা) থেকে রওয়ানা দেয়া হয়েছিল তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী এবং মিয়াঁ আব্দুল গাফফারের অনেক পূর্বে ১৮৬৫ সালের ১০ই জুনে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

৩. মালদহ বিদ্রোহ মামলা :

ভারতের বিভিন্ন এলাকা ও শহরে মুজাহিদগণের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল মালদহ। এই কেন্দ্রটি বঙ্গ প্রদেশে ছিল। ঙঁৎ ওহফরধহ গঁংধষসধহং গ্রন্থের ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার ১৮৭০ সালের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে *(উর্দূ অনুবাদ : হামারে হিন্দুস্তানী মুসলমান, পৃঃ ১১৯)* লিখছেন যে, ওহাবীদের জিহাদ আন্দোলনের এই কেন্দ্রটি 'প্রায় ৩০ বছর' পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৬] এই হিসাবে ১৮৪০ সালের দিকে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মালদহ যেলা ছাড়াও এর সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী যেলার কিছু অংশও এই কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ...এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদীর খলীফা মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী। যিনি মুজাহিদগণের জামা'আতের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি এই সূত্রে দক্ষিণ বাংলার মালদহ যেলায় গেলে সেখানে মুজাহিদগণের খিদমতের জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল মনে হয় এবং সেই যেলার একটি

৬৬. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, অনুবাদ : এম. আনিসুজ্জামান (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০০), পৃঃ ৬৬।-অনুবাদক।

গ্রামে তিনি আবাস গাড়েন। সেখানেই বিবাহ করেন এবং শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন।[৬৭] গ্রামের ছোট-বড় জমিদার ও অন্যান্য লোকজন তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করে। হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি দারুণ তেজস্বী বক্তা ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী ঢঙ্গে মানুষজনকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানাতেন। এর ফল এই হয়েছিল যে, অসংখ্য যুবক তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি লোকজনের নিকট থেকে রীতিমত অর্থ আদায় করে আযীমাবাদ (পাটনা) কেন্দ্রে পাঠাতেন। যাতে এই অর্থ সীমান্তবর্তী মুজাহিদগণের নিকট পৌঁছানো যায়।

মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর তত্ত্বাবধানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সকল ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রফীক মণ্ডল।[৬৮] কয়েক বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

---

৬৭. মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবী মূলত মালীহাবাদ, লাক্ষ্ণৌ-এর মানুষ ছিলেন। পাটনা কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে তাঁকে মালদহ অঞ্চলে দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি দিলালপুর কেন্দ্রের (বিহার, ভারত) মুজাহিদ নেতা মাওলানা আহমাদুল্লাহ আযীমাবাদীর কন্যাকে বিবাহ করেন। সেখানে অবস্থিত শামসুল হুদা মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা করতেন এবং গোপনে মুজাহিদ প্রশিক্ষণ দিতেন। বাংলা অঞ্চলের জিহাদ সংগঠক রফীক মণ্ডলকে তিনিই খেলাফত দিয়ে যান। খ্যাতনামা আলেম গাযী মাওলানা আব্দুল মান্নান ও মাওলানা আব্দুল হান্নান দিলালপুরী (মৃঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৮২) আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর পুত্র ছিলেন *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৪০৯, ৪২৭ (টীকা ৩০) ও ৪৪২-৪৪৩)*।- অনুবাদক।

৬৮. রফীক মণ্ডল ওরফে রফী মোল্লা বিন বরকতুল্লাহ একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। হান্টার তাঁকে নিম্নশ্রেণীর কৃষক বলে উল্লেখ করেছেন (দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৬৬)। মাওলানা আব্দুর রহমান লাক্ষ্ণৌবীর নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করে তিনি জিহাদ আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান কর্মীতে পরিণত হন। বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্ত যেলা চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত নারায়ণপুর কেন্দ্রের (প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ ১৮৪০ খ্রিঃ) তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। ১৮৪০ সালের আগে-পিছে মাওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদীর হাতে তিনি জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং উত্তরবঙ্গে জিহাদ আন্দোলনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৩৬-৩৭)*। হান্টারের ভাষ্য অনুযায়ী ১৮৪৩ সালের মধ্যেই তাঁর অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার মাধ্যমে তিনি 'প্রায় আশি হাযার অনুগামীর এক বিরাট দল' গড়ে তুলেন, যারা 'প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করত' (দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স, পৃঃ ৮৫)। রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ এলাকায় জিহাদ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ও সমাজ সংস্কারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৮৫৩ সালে মুজাহিদগণকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে রফীক মণ্ডলের উপর সরকারের সন্দেহ হয়। তাঁকে তল্লাশি করা হলে এমন কিছু চিঠিপত্র উদ্ধার হয় যার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মুজাহিদগণের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এজন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিন পর তিনি মুক্তি পেলে যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ- যা তিনি নিজে আঞ্জাম দিতেন, স্বীয় পুত্র মৌলভী আমীরুদ্দীনকে সোপর্দ করে দেন।

তদানীন্তন সময়ে এসব এলাকার মুসলমানেরা শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তারা হিন্দুদের মতো মাথায় টিকি রাখত। মেয়েরা নদীর তীরে কাপড় খুলে রেখে গোসল করতে নামত। দরগাহ ও পীরপূজায় সকলে অভ্যস্ত ছিল। তিনি ব্যাপক দাওয়াতী কর্মতৎপরতা গ্রহণ করে হুক্কা বন্ধ করেন। দরগাহ ও পীরপূজার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেন। মাথার টিকি কাটা শুরু করেন। নদীর পাড় থেকে নগ্ন মেয়েদের কাপড় বাড়ীতে এনে পরে তাদের স্বামীদের ডাকিয়ে নছীহত করে কাপড় ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি হলে কুচক্রীমহল ও বিদ'আতী-কবরপূজারী আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে শাসন কর্তৃপক্ষের কান ভারি করে তুলল। ফলে রফী মোল্লা ১৮৫৩ সালে গ্রেফতার হয়ে মুর্শিদাবাদ-এর জঙ্গীপুর জেলে নীত হন। কিন্তু অল্প দিন পরেই মুক্তি পান *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১০-১১, ৪১৩-১৪, ৪৩৬-৩৮)*। রফী মোল্লার পৌত্র স্বনামধন্য আলেম মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরী বলেন যে, ভারতের বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া সদর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া যেলার বাইশী, ধরমগঞ্জ, দীঘলবাঁক, ছাহেবগঞ্জ যেলার বার হারোয়া থানা, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যেলার সূতী থানাধীন নূরপুর, সুজনীপাড়া, শেরপুর, বাহাদুরপুর প্রভৃতি এলাকা এবং পশ্চিম দিনাজপুর যেলার ইটাহার, রায়গঞ্জ, করণদীঘি, গোয়ালপুকুর, চোপড়-ইসলামপুর, গঙ্গারামপুর, তপন প্রভৃতি থানা সমূহের নদী তীরবর্তী এলাকা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের গল্‌গলিয়া রেলস্টেশনের বিপরীতে নেপালের ঝাপ্‌পা ও ভদ্রপুর থানার বহুলোক তাঁর ও তাঁর পুত্র আমীরুদ্দীনের তাবলীগে আহলেহাদীছ হয়েছেন। রফী মোল্লা তাঁর ২য় স্ত্রীর ছেলে শুকরুদ্দীনকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সিত্তানা মুজাহিদ ঘাঁটিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বাড়ী ফিরে এলে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মোল্লাজী কথাবার্তা বন্ধ করে দেন এবং সেই বেদনায় মর্মাহত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই চাঁপাই নারায়ণপুরে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরে নদীগর্ভে কবরটি বিলীন হয়ে যায় *(ঐ, পৃঃ ৪৩৭, ৪৪০)*। রফী মোল্লার জীবদ্দশায় তাঁর ১ম স্ত্রীর ছেলেরা অর্থাৎ কামীরুদ্দীন, আমীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীন বিহারের আগলই নারায়ণপুরে চলে আসেন। ২য় স্ত্রীর ছেলে শুকরুদ্দীন গাযী, সাখাওয়াতুল্লাহ ও মুহাম্মাদ আলী মণ্ডলের বংশধরগণের অনেকে রফী মোল্লার ইন্তেকালের প্রায় ত্রিশ বছর পরে নদী ভাঙ্গনের ফলে নারায়ণপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং আগলই- নারায়ণপুরে তাদের অংশের প্রাপ্য ২২ বিঘা জমি বিক্রি করে বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর যেলার ইটাহার থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন *(ঐ, পৃঃ ৪৪০)*।-অনুবাদক।

মৌলভী আমীরুদ্দীন অত্যন্ত চৌকস ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রভাবের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। গঙ্গা নদীর উভয় তীর ও উহার দ্বীপ সমূহে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী যেলায় তাঁর সুগভীর প্রভাব ছিল। তাঁর একনিষ্ঠতা ও কর্মোদ্দীপনার কারণে সবাই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখত...।[৬৯]

---

৬৯. রফী মোল্লার পুত্র মৌলভী আমীরুদ্দীন পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত জিহাদ আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং উল্লিখিত এলাকা সমূহে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার ফলে তাঁর তত্ত্বাবধানে মালদহ কেন্দ্রটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায় এবং বাস্তবিকই এটি বাংলার সকল যেলাভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর একটি প্রসিদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেজন্য পাটনার নেতৃবৃন্দ তথা মাওলানা এনায়েত আলী, ফাইয়ায আলী ও মাকছূদ আলী জিহাদ সংগঠনের কাজে এখানে এসেই অবস্থান করতেন *(ড. কিয়ামুদ্দীন আহমাদ, হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ১৮৪-১৮৫)*। ১৮৬৮ সালের দিকে আমীরুদ্দীনের আন্দোলন কেমন সুসংগঠিত ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তার কিছুটা স্বীকৃতি হান্টার-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, 'বর্তমানে একটিমাত্র প্রদেশের (বঙ্গদেশের) ওহাবীদের উপরে নযর রাখা এবং তাদের তৎপরতাকে সীমার মধ্যে রাখতে গিয়ে ইংরেজ সরকারকে যে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, তার পরিমাণ স্কটল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি বৃটিশ যেলার বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও ফৌজদারী অপরাধ দমনের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তার সমান। ষড়যন্ত্র (অর্থাৎ আন্দোলন) এত ব্যাপক এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে যে, এর কোথায় শুরু, তা বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। প্রতিটি যেলা কেন্দ্রে হাযার হাযার পরিবারের মাঝে অসন্তোষের বিষ ছড়াচ্ছে। কিন্তু এই তৎপরতার একমাত্র সম্ভাব্য সাক্ষী হচ্ছে এর কর্মীরা, যারা তাদের নেতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করে' *(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, পৃঃ ৮৫)*। ১৮৭০ সালের মালদহ মামলার সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'প্রথম থেকে বিচারের সময় পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের জন্য লোক সংগ্রহ করার কাজে তিনি আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দেন' *(ঐ, পৃঃ ৬৭)*। ১৮৭০ সালে আমীরুদ্দীন গ্রেফতার হন এবং মুর্শিদাবাদ জেলে নীত হন। তাঁর গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে স্বীয় ভাতিজা মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরীর মত হল- তিনি নারায়ণপুর মারকাযের নিকটবর্তী শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত তেররশিয়া-দুর্লভপুর অঞ্চলে তাবলীগী সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রামের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত ছিল। খানাপিনার সময় বাড়ীওয়ালা প্রথানুযায়ী তার প্রথম সন্তানসম্ভবা পুত্রবধুর জন্য তার বাপের বাড়ী থেকে প্রেরিত বিশেষভাবে তৈরি বিরাট আকারের গুড়ের 'বাতাসা' তাঁকে খেতে দেন। তিনি এটাকে কুসংস্কার বলে ফিরিয়ে দেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে বাড়ীওয়ালা ক্ষুব্ধ হন এবং স্থানীয় থানার মুসলমান দারোগা মুর্তযা এবং জনৈক নুরু ফকীরের বাপ ওমর ফকীর-এর মাধ্যমে গোপনে স্থানীয় ইংরেজ প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেন যে, এই ব্যক্তি রাজদ্রোহ

মৌলভী আমীরুদ্দীন জিহাদের জন্য যে সকল ব্যক্তিকে সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। অবশ্য হান্টারের বক্তব্য

প্রচার করেন এবং 'খোরাসানে' (আফগান সীমান্তের মুল্কা-সিত্তানা মূল ঘাঁটিকে খোরাসান বা বড় গুদাম বলা হত) টাকা পাঠান। ফলে তিনি সেখানেই গ্রেফতার হন এবং জিজ্ঞাসাবাদে সবকিছু অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিলের মাধ্যমে তাঁকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজদ্রোহের বিষয়টি অস্বীকার করতে ইংগিত করেন, যাতে তাঁকে 'পাগল' বলে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তিনি রাযী হননি *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২, ৪৩৯, ৪৫৯-৬০)*। তবে তাঁর গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে যে কথা এলাকায় প্রচলিত আছে তা এই যে, অন্যূন ২৫ কিলোমিটার দূরের 'পাকুড়' গ্রামের বিদ'আতীরা তাদের প্রেরিত একজন ছাত্রের মাধ্যমে দিলালপুরের গোপন তথ্য জানতে পারে এবং ইংরেজ সরকারের কাছে তা ফাঁস করে দেয়। যার পরিণতিতে তাঁকে গ্রেফতার বরণ করতে হয় *(ঐ, পৃঃ ৪৪২)*। তাঁর বিচার কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরিত হ'লে সেখানে তাকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয়। এতে খুশী হয়ে জোরে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে উঠলে উক্ত আদেশ রদ করে কালাপানিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয় *(ঐ, পৃঃ ৪১২, ৪৬০)*। পরে সেখানকার একটি মাদরাসায় তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। একদিন তিনি ইংরেজ কর্মকর্তার ছেলেকে বললেন, তোমার আব্বা যে উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আটকে রেখেছেন, সে কাজ এখনও চলছে না বন্ধ হয়েছে? ছেলের মুখে একথা শুনে উক্ত অফিসারের সুফারিশক্রমে ১১ বছর পরে তিনি মুক্তি পান। অন্যান্য বন্দীদের সাথে ছাড়া পেয়ে ১৮৮৩ সালের ৩রা মার্চে কালাপানির পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছেন *(ঐ, পৃঃ ৪১২, ৪৩৯)*। অতঃপর নিজ জন্মস্থান পাটনায় থাকার আবেদন মঞ্জুর হলে তিনি মাওলানা আব্দুর রহীমের সাথে সেখানে থাকতে শুরু করেন। প্রত্যেক মাসে তাঁকে একবার স্থানীয় পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর নিকট হাযিরা দিতে হত। পুলিশকে অবহিত না করে শহরের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি ছিল না *(হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩৩০)*। বিহারের ছাহেবগঞ্জের আগলই-নারায়ণপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯)*। আমীরুদ্দীনের অনেক ভক্ত চাঁপাই নবাবগঞ্জের ভোলাহাট থেকে হিজরত করে মালদহ যেলার বাট্না, কারবোনা প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করছেন- যারা সকলেই আহলেহাদীছ *(ঐ, পৃঃ ৪৩৭)*। রফী মোল্লা ও আমীরুদ্দীনের আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনকারী ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর থিসিসে বলেন, 'রফী মোল্লা ও আমীরুদ্দীনের সূচিত আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও তার বাস্তব ফসল হিসাবে যা আমরা এখন প্রত্যক্ষ করি, তা এই যে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নাগরিক শিরক ও বিদ'আত হতে তওবা করে মুসলিম ও 'আহলেহাদীছ' হয়েছেন এবং অদ্যাবধি বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চল সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবেই পরিচিত। তাদের মধ্যে এখনও শিরক ও বিদ'আত বিরোধী মনোভাব বজায় আছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৩৮-৩৯)*।-অনুবাদক।

হল মুজাহিদগণের একটি সীমান্ত ঘাঁটির ৪৩০ জন ব্যক্তির মধ্যে কমবেশী শতকরা ১০ শতাংশ ওহাবী মুজাহিদ তাঁরই প্রেরিত ছিল।[৭০]

বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে মুজাহিদগণকে সম্মানদানের প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যেত। এর বড় কারণ এটা ছিল যে, ইতিপূর্বে মাওলানা এনায়েত আলী আযীমাবাদী এই অঞ্চলসমূহে অনেক কাজ করেছিলেন। লোকজনের উপর তাঁর সততা ও একনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের দারুণ প্রভাব ছিল।[৭১]

---

৭০. দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স, পৃঃ ৬৮।-অনুবাদক।

৭১. মাওলানা বেলায়েত আলীর মেজভাই মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৩৩-১৮৪৩ এবং ১৮৪৭-১৮৪৯ দু'বারে মোট বারো বছর বাংলাদেশ অঞ্চলে জিহাদের প্রচার ও সংগঠনে অতিবাহিত করেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪০৯, ৪৩৫)*। মাওলানার ভাতিজা মাওলানা আব্দুর রহীম ছাদেকপুরী 'তাযকেরায়ে ছাদেক্বাহ' গ্রন্থে বলেছেন, 'তিনি প্রথমবারে একটানা সাত বৎসর এই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে অবর্ণনীয় কষ্টভোগ ও ধৈর্যের সাথে ভ্রমণ করেছেন। তিনি লাখো মানুষকে অন্ধকার গহবর হতে টেনে এনে হেদায়াতের আলোকবর্তিকার একনিষ্ঠ প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী করেছেন। তাঁর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও তাঁদের উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্ততিগণ আজও বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত' *(ঐ, পৃঃ ২৭১, ৩০১)*। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) ১৯১৩ সালে একবার বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি পশ্চিম বাংলার দুম্কা ও মুর্শিদাবাদ যেলার কয়েকটি গ্রাম যেমন দিলালপুর, ইসলামপুর, জঙ্গীপুর ও বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলাধীন নারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রাম সফর করেন। পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে তিনি স্বীয় 'আখবারে আহলেহাদীছ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেখানে একস্থানে তিনি বলেন, 'আমি এই সফরে কেবলি চিন্তা করেছি বাংলাদেশে আহলেহাদীছের সংখ্যা এত বেশী কিভাবে হল ও কার দ্বারা হল? আমাকে বলা হল যে, এসব মাওলানা এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর বরকতেই হয়েছে' *(ঐ, পৃঃ ২৭১, ৩০১-৩০২)*। গবেষক ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মাওলানা এনায়েত আলী সম্পর্কে বলেন, 'মাওলানার কর্মোদ্দীপনা ছিল কিংবদন্তীর মতো। যেকাজেই তাঁকে লাগানো হত, সেকাজেই তিনি সেরা প্রমাণিত হতেন। যখন থেকেই তিনি আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা ইসমাঈল (রহঃ)-এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তখন থেকেই এই জমিদারপুত্র সকল আরামকে হারাম করে আমীরের নির্দেশ মোতবেক দাওয়াত ও জিহাদের পথে জানমাল ওয়াক্ফ করে দেন। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার প্রায় সবটুকু সময় কেটেছিল বাংলাদেশ অঞ্চলে। দুইবার প্রায় একযুগ বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে শিরক ও বিদ'আতে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে তিনি যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন, তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সীমান্তের সশস্ত্র জিহাদে বাঙ্গালী মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় যোগদান করে, যা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারি থাকে। বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক আহলেহাদীছ থাকার মূলে তাঁরই অবদান

১৮৭০ সালে মালদহে মাওলানা আমীরুদ্দীনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাঁর সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণ ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা হয়েছিল। ১৮৭২ সালের মার্চে তিনি কালাপানি পৌঁছেন। দশ-এগারো বছরের যুলুম-নির্যাতন ও দেশান্তরের পর ১৮৮৩ সালে (১৩০০ হিঃ) তিনি কালাপানি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[৭২]

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মুজাহিদগণকে সাহায্য করার অপরাধে ওহাবীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে এটি ছিল তৃতীয়। ইংরেজদের নিকট একে 'মালদহ বিদ্রোহ মামলা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৪. রাজমহল বিদ্রোহ মামলা :

মালদহ বিদ্রোহ মামলার অল্প কিছুদিন পর ১৮৭০ সালে ওহাবীদের বিরুদ্ধে রাজমহলে[৭৩] চতুর্থ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার মূল

ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে একটি ঘটনা নিম্নরূপ : একদা পাবনা শহরে তাবলীগে এসে তিনি 'চাপা মসজিদে' ওঠেন। সেদিন ছিল মাদার পীরের বাঁশ উঠানো উৎসব। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট আকারে উৎসব চলছিল। মাওলানা সোজা উৎসবমঞ্চে উঠে গিয়ে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে এক দরদমাখা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। উৎসবের হোতা গাদল খাঁ সহ উপস্থিত শত শত লোক তওবা করে মাওলানার হাতে বায়'আত করেন। পাবনার রাধাকান্তপুরের উক্ত গাদল খাঁ ও তার পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আলী খাঁ আজীবন জিহাদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন *(ঐ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪)*। তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জিহাদ আন্দোলনের আমীর মাওলানা এনায়েত আলী তৎকালীন যশোর যেলার হাকিমপুরকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপক তাবলীগী তৎপরতা চালাতে থাকেন। তিনি কোন এলাকায় গেলে প্রথমে নছীহতের মাধ্যমে তাদেরকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত হবার আহ্বান জানাতেন। অতঃপর মসজিদ না থাকলে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন ও ইমাম নিয়োগ করতেন। ইমাম নিয়োগের পর তাঁর নেতৃত্বে জামা'আত কায়েম করতেন ও স্থানীয় যাবতীয় বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব উক্ত ইমামের উপরে ন্যস্ত করতেন *(ঐ, পৃঃ ৪১৪)*।-অনুবাদক।

৭২. মুক্তির সময় তিনি স্মৃতি হিসাবে আন্দামানের ঝিনুক, শামুক, কড়ি ও কাঠের বাক্স নিয়ে আসেন। যা এখনো তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিকট মওজুদ রয়েছে *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১২, ৪১৯, ৪২৮, টীকা-৪৩)*।-অনুবাদক।

৭৩. রাজমহল প্রথমে মালদহ যেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সেটিকে মুর্শিদাবাদ যেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে তা বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগনার একটি সাব-

Contents

টার্গেট ছিলেন ইবরাহীম মণ্ডল।[৭৪] যিনি রাজমহল শহরতলীর ইসলামপুর নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। বিহার প্রদেশের ভাগলপুর কমিশনারীতে রাজমহল অবস্থিত।

ডিভিশন। গঙ্গা নদীর এপারে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ যেলা এবং ওপারে রাজমহল অবস্থিত। মালদহ ও রাজমহল কেন্দ্র দু'টি মিলেমিশে জিহাদ আন্দোলনের কাজ করত *(দ্র. হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০২; টীকা-১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৪০)*।-অনুবাদক।

৭৪. ইবরাহীম মণ্ডল ছিলেন মূলতঃ নারায়ণপুরের নিকটবর্তী মুর্শিদাবাদ যেলাধীন লালগোলা থানার ঝাউডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। পরে তিনি সম্ভবতঃ ১৮৪০ সাল হতে ১৮৫৩ সালের রফী মোল্লা গ্রেফতার হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে রাজমহলের ইসলামপুরে (দিলালপুরের তিন মাইল উত্তরে) হিজরত করেন। তাঁর অনুরোধেই রফী মোল্লা দিলালপুরে হিজরত করেছিলেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪২৭-২৮, ৪৩৯-৪০)*। রফী মোল্লার পৌত্র মাওলানা আহমাদ হোসাইন শ্রীমন্তপুরীর বক্তব্য অনুযায়ী রফী মোল্লা নিজ হাতে ইবরাহীম মণ্ডলের মাথার টিকির চুল কেটে 'আহলেহাদীছ' করেন এবং তাঁকে ঐ এলাকার দায়িত্বশীল হিসাবে বায়'আত নেন। এর ফলে ইবরাহীম মণ্ডলের দুই মেয়ের বিবাহ সংকট দেখা দিলে রফী মোল্লা নিজের দুই ছেলে কামীরুদ্দীন ও শামসুদ্দীনের সাথে তাদের বিয়ে দেন *(ঐ, পৃঃ ৪২৮, ৪৬০)*। জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী ইবরাহীম মণ্ডল ইসলামপুরে এসে চুপ থাকেননি। তিনি পাহাড়ীয়া অঞ্চলের লোকদেরকে জিহাদের উদ্দেশ্যে সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর নিরলস দাওয়াত ও জিহাদের তৎপরতার ফলে স্থানটি কালক্রমে মুজাহিদ কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাছাড়া একদিকে প্রশস্ত নদী ও অপরদিকে দুর্গম পাহাড়ীয়া অঞ্চল হওয়ার কারণে স্থানটি মুজাহিদগণের ট্রেনিং ও আশ্রয় কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পাটনা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মাওলানা আহমাদুল্লাহ এখানে আসেন এবং ইবরাহীম মণ্ডলজীর পরামর্শক্রমে দুই মাইল দক্ষিণে 'দিলালপুর' নামক স্থানটিকে কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করেন ও সেখানে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন *(ঐ, পৃঃ ৪৪১)*। রাজমহলের সহকারী পুলিশ কমিশনার উইলমোট (Wilmot) পুলিশের ডিআইজি রেইলী-কে (Reily) অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ কমিশনার নবকেষ্ট ঘোষকে মালদহে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। ঘোষ সেখানে যান এবং এক সপ্তাহ অবধি রেশমী কাপড়ের ঝুট ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে বহু তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন। তিনি তথ্য সংগ্রহকালে অবগত হন যে, কালিয়া চকের (মালদহ) কয়েকটি গ্রামে জিহাদের জন্য ফাণ্ড সংগ্রহ করা হয়। অত্র এলাকায় নাযীর সরদার নামে এক ব্যক্তি চাঁদা সংগ্রহের অন্যতম দায়িত্বশীল। তিনি চাঁদা সংগ্রহ করে ইবরাহীম মণ্ডলের কাছে পাঠিয়ে দেন। ঘোষ সব তথ্য লাভ করে ফিরে গিয়ে মালদহের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ৮ জন চাঁদা সংগ্রহকারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আবেদন করেন। এদের মধ্যে নাযীর সরদার ও ইবরাহীম মণ্ডল অন্যতম। ডিআইজি পুলিশ রেইলী সতর্কতাবশত নিজে রাজমহলে না গিয়ে নবকেষ্ট ঘোষকে সড়কপথে ইসলামপুরে পাঠিয়ে দেন। যাতে তাঁর (ডিআইজি) উপস্থিতি টের পেয়ে মণ্ডলজী পালাতে না

ইবরাহীম মণ্ডল অত্যন্ত সাহসী ও মুত্তাক্বী ব্যক্তি ছিলেন। আযীমাবাদের (পাটনা) আলেমগণের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সীমান্ত এলাকায় নগদ অর্থও প্রেরণ করতেন এবং জিহাদের জন্য লোকও পাঠাতেন। হান্টার তার ঙঁৎ ওহফরধহ গঁংধষসধহং গ্রন্থে যেভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ সরকারের নিকট ইনি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লিখছেন যে, ১৮৭০ সালে যখন ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলোর উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তখন ইবরাহীম মণ্ডল ঐ সমস্ত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে বিশেষভাবে ষড়যন্ত্র মামলার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। হান্টার এও বলেছেন যে, 'তার ষড়যন্ত্রের জাল যেকোন দুর্বল সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল'।

১৮৭০ সালের অক্টোবরে ইবরাহীম মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ কালাপানিতে নির্বাসন ও সম্পত্তি বাযেয়াফ্তকরণের সাজা হয়েছিল।[৭৫] মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর থানেশ্বরী- যিনি সেই দিনগুলিতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন, তিনি নিজ গ্রন্থ 'কালাপানি'তে লিখছেন- 'একজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি ইবরাহীম মণ্ডলকে ইসলামপুরে গ্রেফতার করে এবং নিজেদের সাধারণ ও পুরনো সাক্ষীদের দ্বারা ইচ্ছামতো সাক্ষী প্রদান করিয়ে বেচারাকে কালাপানিতে রওয়ানা করে দেয়'।

৫. আযীমাবাদের ২য় বিদ্রোহ মামলা :

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের প্রথম মামলা ১৮৬৫ সালে আযীমাবাদে (পাটনা) দায়ের করা হয়েছিল। এর ছয়

পারেন। ঘোষ এবার এক মুসলমান শিক্ষকের বেশ ধরে টিউশনি তালাশের বাহানায় সেখানে গিয়ে অবস্থান নেন। ঘটনাক্রমে মণ্ডলজীর এক ভাতিজার সাথে ঘোষের দেখা হয়ে যায়। সে ঘোষকে একথা বলে সরাসরি তার চাচার কাছে নিয়ে যায় যে, আমার চাচা যেকোন শিক্ষকের সহযোগিতার জন্য পুরা গ্রামে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। ঘোষের পিছে পিছে দুই পুলিশ কনস্টেবলও সেখানে যায়। তাদের সহায়তায় ঘোষ মণ্ডলজীকে গ্রেফতার করেন। সহকারী কমিশনার উইলমোট ও তার সহকারী ইবরাহীম মণ্ডলকে গ্রেফতারের ব্যাপারে ঘোষকে সহযোগিতা করার জন্য রাজমহল থেকে হাতিতে আরোহণ করে ইসলামপুর এসেছিলেন *(দ্র. হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০২-৩০৪)*।-অনুবাদক।

৭৫. ১৮৭২ সালে তিনি কালাপানিতে দ্বীপান্তর হন। ১৮৭৬ সালে সেখান থেকে ফিরে আসেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯)*।- অনুবাদক।

বছর পর ১৮৭১ সালে ২য় মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় আসামী ছিলেন ৭ জন। এদের নাম হল- ১. মাওলানা মুবারক আলী ২. মাওলানা তাবারুক আলী ৩. হাজী দ্বীন মুহাম্মাদ ৪. হাজী আমীনুদ্দীন ৫. পীর মুহাম্মাদ ৬. হাশমত দাদ খান ও ৭. আমীর খান।[৭৬]

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বারবুরের আদালতে ১৮৭১ সালের ১লা মার্চে মামলার প্রাথমিক শুনানি শুরু হয়। ২৭শে মার্চে চার্জশিট প্রদান করে অপরাধীদেরকে সেশন জজ আদালতে সোপর্দ করে দেয়া হয়। ১৮৭১ সালের ১লা মে থেকে সেশন জজ মিঃ প্রিন্সপ মামলার শুনানি শুরু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে

৭৬. বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী আমীর খান ও হাশমত দাদ খান পাটনা শহরের আলমগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। কলকাতায় এই দুই ভাইয়ের চামড়ার প্রসিদ্ধ আড়ৎ ছিল। সরকার তাদের ব্যাপারে অনেক আগ থেকেই সন্দিহান ছিল। সরকারের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট ছিল যে, যখন আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে (এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী) মুচলেকা দিতে বলা হয়েছিল, তখন তারাই তাদের যামিন হয়েছিলেন। তাছাড়া ইবরাহীম মণ্ডলের নিকট জিহাদের ফাণ্ডের জন্য যে নগদ অর্থ জমা হত সেগুলো আমীর খানের মাধ্যমে আশরাফীতে (প্রায় ১৬ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা) রূপান্তরিত করা হত এবং মুবারক আলীর মাধ্যমে গোপনে সেগুলো সীমান্তের জিহাদ কেন্দ্রে পাঠানো হত। তাই সরকার তাদেরকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে গ্রেফতার করতে পারছিল না। ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুন তাবারুক আলীর শ্বশুর পীর মুহাম্মাদকে গ্রেফতারের পর তাঁর নিকটে আমীর খানের একটি পত্র পাওয়া যায়। সরকার প্রমাণ হাতে পেয়ে ১৮৬৯ সালের ৯ই জুলাই কলকাতা থেকে আমীর খানকে গ্রেফতার করে গয়া জেলে বন্দী করে। অতঃপর দ্রুত আলীপুর (কলকাতা) জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে হাশমত দাদ খানকেও গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় আমীর খানের বয়স ছিল ৭৫ বছর এবং হাশমত দাদ খানের বয়স ছিল ৬৭ বছর। গ্রেফতারের পর তাদের চামড়ার আড়ৎ লুট হয়ে যায়। ১৮৭০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদেরকে গ্রেফতারের কোন কারণ জানানো হয়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলাও রুজু করা হয়নি। ফলে খান ভ্রাতৃদ্বয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, হয় তাদেরকে গ্রেফতারের কারণ জানানো হোক, না হয় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হোক। অতঃপর ১৮৭১ সালের মার্চে পাটনায় তাদের মামলার শুনানি শুরু হয়। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ আন্দোলনে আর্থিক সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়। পরে রায়ে হাশমত দাদ খানকে ছেড়ে দেয়া হয়। কেননা তার বিরুদ্ধে কোন চাক্ষুস সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। তিনি ১৮৭৮ সালের কিছু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আমীর খান ৯ বছরের বেশী জেল খাটার পর ১৮৭৮ সালের নভেম্বরের শুরুতে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের (Lord Lytton) সুফারিশক্রমে মুক্তি পান এবং তার পরপরই ৮ই নভেম্বর তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দু'জনকেই পাটনাতে দাফন করা হয় *(হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০৭, ৩১৭-১৯, ৩২৭-২৮, ৩৩০-৩২; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৯)*।-অনুবাদক।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ১৩৬ জন সাক্ষীর দীর্ঘ তালিকা আদালতকে প্রদান করা হয়। কিন্তু ১১৩ জনকে আদালতে হাযির করা হয়। ৪৬ জন ব্যক্তি আসামীদের পক্ষ থেকে ছাফাই সাক্ষ্য প্রদান করেন। মাঝখানে কিছুদিন শুনানি মুলতবী থাকে। অতঃপর ১৮৭১ সালের শেষের দিকে মামলার রায় শোনানো হয়। এটি ঈসায়ী ঊনবিংশ শতক ও হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষ বড় ষড়যন্ত্র মামলা ছিল। যেটি 'বড় ওহাবী মোকদ্দমা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ্‌র গ্রেফতারির পর এই মামলার আসামী মাওলানা মুবারক আলীকে ছাদেকপুরের মুজাহিদ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইনি প্রথমে ১৮৬৮ সালে গ্রেফতার হন। এরপর ১৮৭১ সালের মামলায় ধৃত হন এবং তাঁকে এত কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা মুবারক আলীর ছেলে মাওলানা তাবারুক আলীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, ১৮৬২ সালের যুদ্ধে সীমান্তের আম্বালা নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ যে যুদ্ধ করেছিলেন- ইনি তৎকালীন আমীরে মুজাহিদীন মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর একটি বাহু পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এই অপরাধে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ কালাপানিতে নির্বাসনের সাজা হয়। ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে মাওলানা আমীরুদ্দীন প্রমুখের সাথে কালাপানি পৌঁছেন। ১০ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পান। হাজী দ্বীন মুহাম্মাদ ও পীর মুহাম্মাদকে কয়েকবার গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। এভাবে হাজী আমীনুদ্দীনকেও বারবার গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন মামলায় কয়েকবার ফাঁসানো হয়।

জিহাদ আন্দোলনের কতিপয় সাহায্যকারী :

বালাকোট যুদ্ধের পর পরিস্থিতি এমন দিকে মোড় নেয় যে, আহলেহাদীছ আলেমগণই কেবল জিহাদ আন্দোলনের প্রকৃত সাহায্যকারী হন এবং এই জামা'আতের সাথে কেবল তাদেরই সম্পর্ক বজায় থাকে। এরাই উপরোল্লিখিত পাঁচটি ওহাবী মামলার নিশানায় পরিণত হন। ঐ সমস্ত মামলার বিস্তারিত বিবরণ তো বহু দীর্ঘ। কিন্তু এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে ইঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এক্ষণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে মুজাহিদীন জামা'আতের কতিপয় সাহায্যকারীর পরিচয় পেশ করা হচ্ছে :

১. মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীর গভীর মনীষা সমগ্র উপমহাদেশে সুবিদিত ছিল। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর বহু গ্রন্থপ্রণেতা ছাত্র এবং জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি ১৩২৯ হিজরীর ৯ই রবীউল আউয়াল (১০ই মার্চ ১৯১১ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

২. মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী উপমহাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তিনি সর্বদা জামা'আতে মুজাহিদীনকে আর্থিক ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এটি চরম ইংরেজ সরকার বিরোধী জামা'আত হওয়ায় এর যে কোন ধরনের সাহায্যকারী ইংরেজদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দিত ছিল। মাওলানাও সর্বদা তাদের ক্রোধের পাত্র ছিলেন। তিনি ১৩৩৬ হিজরীর ৪ঠা জুমাদাল আখেরাহ (১৭ই মার্চ ১৯১৮ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

৩. কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরী পূর্ব পাঞ্জাবের সাবেক শিখ রাজ্য পাটিয়ালার সেশন জজ ছিলেন। এটা ছিল অনেক বড় পদ যাতে তিনি সমাসীন ছিলেন। তিনি গোপনে জামা'আতে মুজাহিদীনকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তিনি ১৩৪৯ হিজরীর ১লা মুহাররমে (৩০শে মে ১৯৩০) মৃত্যুবরণ করেন।

৪. মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী বিদ্যাবত্তা ও রাজনৈতিক দিক থেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ও তাঁর পুত্ররা সর্বদা জামা'আতে মুজাহিদীনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৩৬১ হিজরীর ৬ই যিলক্বদ (১৬ই নভেম্বর ১৯৪২ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন আহমাদ ক্বাছূরী আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রসিদ্ধ আলেম ও মাওলানা আব্দুল কাদের কাছূরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। তিন বছর জলন্ধর যেলার দাসূহা নামক স্থানে তাঁকে নযরবন্দী করে রেখেছিল। উপমহাদেশকে ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাধীন করানো এবং জামা'আতে মুজাহিদীনকে সহযোগিতা করাই ছিল তাঁর অপরাধ। তাঁর মৃত্যু তারিখ ২৬শে যিলক্বদ ১৩৯০ হিজরী (২৪শে জানুয়ারী ১৯৭১ খ্রিঃ)।

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী এম.এ ক্যান্টবও মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরীর প্রিয়পুত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং এই জামা'আতের বেহিসাব আর্থিক সহযোগিতাও করেন। তিনি ১৩৭৫ হিজরীর ২৬শে জুমাদাল উলা (১২ই জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী লাক্ষাবী মাদানী পাঞ্জাবের অনেক বড় আলেম পরিবারের খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনের বিশিষ্ট সাহায্যকারীদের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হত। তিনি ১৩৯৩ হিজরীর ২৩শে যিলক্বদ (১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ্রিঃ) এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী জগতে পাড়ি জমান। তিনি 'বাক্বী' (মদীনা মুনাউওয়ারাহ) কবরস্থানে দাফন হন।[৭৭]

৮. মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ গযনভী উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেম পরিবারের খ্যাতিমান সদস্য ছিলেন। লাহোরের চীনাওয়ালী জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনকে সহযোগিতা করার কারণে তাঁকে ইংরেজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকত। তিনি ১৩৪৯ হিজরীতে (১৯৩০ খ্রিঃ) পরপারে পাড়ি জমান।

৯. হাফেয আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী ১৩০১ হিজরীতে (১৮৮৪ খ্রিঃ) ওমরপুর (যেলা মুযাফফর নগর, ইউপি) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান-এর পিতা ছিলেন এবং জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ইংরেজ পুলিশ তাঁর পিছনে লেগে থাকত। সর্বশেষ ১৩৩৪ হিজরীর ১লা জুমাদাল উলা (৬ই মার্চ ১৯১৬ খ্রিঃ) সন্ধ্যায় গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছে, তখন ঐ দিন সকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁকে দাফনও করা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন!

এগুলি হল কতিপয় ব্যক্তির নাম। নতুবা অসংখ্য ব্যক্তি ছিলেন যারা যথারীতি মুজাহিদগণের কেন্দ্রে বড় অংকের অর্থ পাঠাতেন। তাঁদের মধ্যে আয়নুল

---

৭৭. মাননীয় লেখক এখানে জান্নাতুল বাক্বী লিখেছেন। এটি মারাত্মক ভুল এবং ভ্রান্ত ফের্কা শী'আদের অনুকরণ মাত্র।-অনুবাদক।।

কুযাত লাক্ষ্ণৌভী, মাওলানা যায়নুল আবেদীন (ঢাকা),[৭৮] ডাঃ মুহাম্মাদ ফরীদ (দারভাঙ্গা), শায়খ আতাউর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা, রহমানিয়া মাদরাসা, দিল্লী; হাফেয হামীদুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বেনারসী, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, কাযী আব্দুর রহীম (গুজরানওয়ালা), মাওলানা আব্দুল খাবীর আযীমাবাদী, হাকীম নূরুদ্দীন লায়ালপুরী, শেঠ মুহাম্মাদ দাঊদ দেহলভী, হাজী আতাউল্লাহ উডানওয়ালা (যেলা ফায়ছালাবাদ) ও অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তি শামিল আছেন। না প্রত্যেকের নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব, আর না তাদের পরিচয় পেশ করা সম্ভব।

আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব :

উল্লিখিত বুযুর্গানে দ্বীন ছাড়াও আরো অনেক বুযুর্গ ছিলেন যারা স্থায়ীভাবে মুজাহিদগণের কেন্দ্রকে নিজেদের আবাসস্থল নির্ধারণ করেছিলেন এবং এই সঠিক পথে নিজেদের জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন ছূফী অলি মুহাম্মাদ (ফাতূহীওয়ালা, যেলা ক্বাছূর)। এই পবিত্র দলেরই একজন সদস্য ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর। ১৩৫৩ হিজরীর রামাযান মাসের প্রথম রাত্রে যাকে আব্দুল হালীম নামের এক ব্যক্তি মুজাহিদীন কেন্দ্র চামারকান্দে শহীদ করে দিয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর মূলত ফীরোযপুর যেলার (পূর্ব পাঞ্জাব) 'মালওয়া' নামক গ্রামের বাশিন্দা ছিলেন। তিনি ১৩০২ হিজরীতে (১৮৮৫ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ছিলেন। ১৩৩৩ হিজরীতে (১৯১৫ খ্রিঃ) মুজাহিদগণের কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন। অত্যন্ত বাস্তববাদী ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। জামা'আতে মুজাহিদীনই তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।[৭৯]

জামা'আতে মুজাহিদীনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী। তিনি ১২৯৯ হিজরীর ২৭শে রামাযান (১২ই

---

৭৮. এক্ষেত্রে ঢাকার বংশাল নিবাসী হাজী বদরুদ্দীন ওরফে বট্টু হাজীর কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য *(দ্র. হিন্দুস্তান মেঁ ওহাবী তাহরীক, পৃঃ ৩০৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪৭৪; মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, মর্দে মুজাহিদ হাজী বদরুদ্দীন (ময়মনসিংহ : ১৯৭২), পৃঃ ২১-২২)*।-অনুবাদক।

৭৯. তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১০-১১।-অনুবাদক।

আগস্ট ১৮৮২ খ্রিঃ) ওয়াযীরাবাদে (যেলা গুজরানওয়ালা) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে রেলওয়ে আদালতে চাকুরীতে নিয়োজিত হন। কিন্তু দ্রুত চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ১৯০৩ সালে আসমাস্ত পৌঁছে যান। যেটি সে সময় মুজাহিদগণের কেন্দ্র ছিল এবং মাওলানা আব্দুল করীম ছিলেন জামা'আতের আমীর। জিহাদ আন্দোলনে তিনি অপরিসীম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে কয়েকবার গ্রেফতার করে এবং জীবনের অনেকটা সময় তিনি জেলে বন্দী থাকেন। কেন্দ্রীয় আমীরের পক্ষ থেকে তাঁকে ভারতে মুজাহিদীন জামা'আতের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। গোপনে তিনি সমগ্রদেশে ঘুরতেন এবং জামা'আতের কর্মসূচী অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাতেন। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করেছিল। ৩০২ ধারা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি ব্রিটিশ সরকারের দায়ের করা মামলাসমূহে ভুগতে থাকেন। এভাবে বছরের পর বছর আত্মগোপন ও দেশান্তরের পর যখন উপমহাদেশের স্বাধীনতার ৮ মাস অতিবাহিত হয়েছিল, তখন ১৩৬৭ হিজরীর ১৭ই জুমাদাল আখেরাহ (২৭শে এপ্রিল ১৯৪৮ খ্রিঃ) তিনি নিজ জন্মভূমি ওয়াযীরাবাদে আসলে ব্রিটিশ আমলের দায়ের করা মামলাসমূহের আলোকে পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। এজন্য লোকজন পাকিস্তান সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং গভর্ণর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১৩৭০ হিজরীর ২৯শে রজব (৫ই মে ১৯৫১ খ্রিঃ) ওয়াযীরাবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী তাঁকে বালাকোটে দাফন করা হয়।[৮০]

জামা'আতে মুজাহিদীনের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সদস্যগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন ছূফী আব্দুল্লাহ। যিনি ১৩০৪ হিজরীর (১৮৮৭ খ্রিঃ) দিকে ওয়াযীরাবাদে (যেলা গুজরানওয়ালা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক জীবন নানাভাবে অতিক্রান্ত হয় এবং কাছাকাছি ১৩২০ হিজরীতে (১৯০২ খ্রিঃ) তিনি

৮০. বর্তমানে বালাকোটে সাইয়িদ আহমাদ শহীদের কবরের পাশেই তাঁর কবর রয়েছে *(দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩১২; আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'বালাকোটের রণাঙ্গনে', আত-তাহরীক, আগস্ট ২০১৪, পৃঃ ৩৫)*।-অনুবাদক।

জামা'আতে মুজাহিদীনে যোগদান করেন। অতঃপর দ্রুত মুজাহিদগণের কেন্দ্রে চলে যান। তিনি এই জামা'আতের অপরিসীম খিদমত করেন এবং এই পথে কঠিন কষ্ট সমূহ স্বীকার করেন। পুরা যৌবনকাল এ পথে ব্যয় করে দেন। ১৩৪১ হিজরীর (১৯২৩ খ্রিঃ) আগেপিছে উডানওয়ালায় (যেলা ফায়ছালাবাদ) আসেন এবং সেখানে 'দারুল উলূম তা'লীমুল ইসলাম' নামে মাদরাসা চালু করেন। অসংখ্য ছাত্র ও আলেম এই দারুল উলূম থেকে ইলম হাছিল করেছেন। এরপর উডানওয়ালা থেকে তিন মাইল দূরত্বে মামূঁকাঞ্জনে 'জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জামে'আটি কয়েক একর জমিতে অবস্থিত।

ছূফী আব্দুল্লাহ এমন আলেম ছিলেন যার দো'আ কবুল হত। তাঁর দো'আ কবুলের ঘটনাসমূহ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আমি 'তাযকেরায়ে ছূফী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ' নামে তাঁর পৃথক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছি। যেটি সাড়ে চারশ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং মাকতাবা সালাফিইয়াহ, শীশমহল রোড, লাহোর সেটি প্রকাশ করেছে। তিনি ১৩৯৫ হিজরীর ১৪ই রবীউল আখের (২৮শে এপ্রিল ১৯৭৫) মৃত্যুবরণ করেন এবং জামে'আ তা'লীমুল ইসলাম (মামূঁকাঞ্জন)-এর সীমানার মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সাথে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এ জামা'আতের আমীর মাওলানা আব্দুল করীমের সাথে মাওলানা আযাদের যোগাযোগ থাকত এবং জামা'আতের বিভিন্ন সদস্যও গোপনে মাওলানার সাথে সম্পর্ক রাখত। আমীর ছাহেবের অনুরোধে একবার মাওলানা আযাদ তাঁর চিকিৎসার জন্য এক তরুণ ডাক্তারও সেখানে (মুজাহিদ কেন্দ্রে) প্রেরণ করেছিলেন। যিনি মাওলানার সম আক্বীদার লোক ছিলেন। এই ডাক্তার কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

এই হল জামা'আতে মুজাহিদীন ও এর কতিপয় সাহায্যকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এসকল ব্যক্তি আহলেহাদীছ মাসলাকের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের কবল থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করা।

জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা :

এছাড়া উপমহাদেশে যেসব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোতেও আহলেহাদীছ আম জনতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বরং কোন কোন সংগঠন আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যেমন ১৯১৯ সালের শেষের দিকে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রচেষ্টায় 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রথম সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। যা ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহলীর সভাপতিত্বে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি লিখিত স্বাগত ভাষণ পাঠ করেছিলেন। অতঃপর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রস্তাব ও প্রচেষ্টায় মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীকে জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর সভাপতি এবং মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভীকে সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়েছিল।[৮১] ঐ সময় দেশের সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ছিল।

---

৮১. ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯১৪-১৯১৮) মিন্টু মরলে (Minto Morley) ভারতীয়দের জন্য একটি স্কীম নিয়ে ভারতে আসেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে এটি 'মিন্টু মরলে স্কীম' নামে পরিচিত। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহলীর উৎসাহে লাক্ষ্ণৌতে ওলামায়ে কেরামের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানদের কিছু ধর্মীয় বিষয় বিবেচনার জন্য আলেমগণের একটি প্রতিনিধি দল মিন্টু মরলের সাথে দেখা করবে মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হয়। লাক্ষ্ণৌর সেই সম্মেলনে প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, ফাতিহে কাদিয়ান ও শেরে পাঞ্জাব খ্যাত মুনাযির মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামের আলোকে জনসাধারণকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আলেমগণের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উক্ত সম্মেলনে পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দু'দিন পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়াই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। তথাপি মাওলানা অমৃতসরী নিরাশ না হয়ে বিভিন্ন জালসা ও সম্মেলনে এবং সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকায় এ ধরনের অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপরে আলোকপাত করতে থাকেন। অতঃপর ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তাঁর প্রচেষ্টায় দিল্লীতে একটি তাবলীগী জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সুযোগে তিনি লাক্ষ্ণৌ সম্মেলনে পেশ করা প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করেন। অনেক আলেম তাঁর এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে অমৃতসরে খেলাফত মজলিস ও মুসলিম লীগের সম্মেলন ছিল। এতে খেলাফত ও

তুরস্কের বিষয়ে আলোচনার জন্য দেশের অনেক প্রথিতযশা আলেমের অংশগ্রহণের আশা করা হচ্ছিল। এ উপলক্ষে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা সাইয়িদ দাঊদ গযনভী আলেমগণকে অমৃতসরে আসার দাওয়াত দেন। যাতে এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। দিল্লী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর অমৃতসরে ভারতবর্ষের আলেমগণের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়। এতে দেশবরেণ্য ৫২ জন আলেম অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে সর্বভারতীয় আলেমগণের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সম্মেলনে মাওলানা অমৃতসরী মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলভীকে সভাপতি এবং মাওলানা আহমাদ সাঈদ দেহলভীকে সেক্রেটারী করার প্রস্তাব দিলে মাওলানা সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ তাতে সমর্থন দেন। এই সম্মেলনে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠিত হয়। হাকীম মুহাম্মাদ আজমাল খাঁ সংগঠনের নীতিমালার খসড়া তৈরীর জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ফলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ ও মাওলানা খায়রুযযামানের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নীতিমালা তৈরী করে ১লা জানুয়ারী ১৯২০ইং তারিখে পেশ করলে তা গৃহীত হয়। এ অধিবেশনে মাল্টা দ্বীপে বন্দী মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর মুক্তির বিষয়ে প্রথম রেজুলেশন পাশ হয়েছিল। মাওলানার মুক্তির দাবীতে ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। এর খরচ বহন করেছিলেন মাওলানা অমৃতসরী। ১৯২০ সালের ১৯-২১শে নভেম্বর দিল্লীতে মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর সভাপতিত্বে জমঈয়তের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে পাঁচ শতাধিক আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আকরম খাঁ অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রস্তাব পেশ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং তা ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়া পর্যন্ত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী, সাইয়িদ মুহাম্মাদ ফাখের এলাহাবাদী, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা সাইয়িদ দাঊদ গযনভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী, মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী, মাওলানা আব্দুল গাফফার গযনভী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী, মাওলানা আব্দুল হক অমৃতসরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী, মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ক্বাছূরী প্রমুখ খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেমগণ এ সংগঠনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। দেশ বিভাগের পর সত্তর দশকে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর সভাপতিত্ব পর্যন্ত তিনি সহ মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী প্রমুখ

মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরেই কংগ্রেসের সম্মেলন হয়েছিল। ঐ প্যাণ্ডেলেই মাওলানা শওকত আলীর সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া খেলাফত মজলিস'-এর এবং সেখানেই হাকীম মুহাম্মাদ আজমাল খাঁর সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এবং তিনি লিখিত স্বাগত ভাষণ পেশ করেছিলেন।

মজলিসে আহরার প্রতিষ্ঠা :

১৯২৯ সালে 'মজলিসে আহরার' প্রতিষ্ঠা লাভ করলে মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনভী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁকে এর সেক্রেটারী জেনারেল করা হয়।

মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী ১৯২০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। খেলাফত মজলিসের সভাপতিত্বও কয়েক বছর তাঁর ওপরে ন্যস্ত ছিল।

মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসী (মৃঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রিঃ/৩রা ছফর ১৩৬৯ হিঃ) দেশের স্বাধীনতার জন্য অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলসমূহে অন্তর্ভুক্ত হন এবং জেল-যুলুমের কষ্ট সহ্য করেন। তিনি জামা'আতে

আহলেহাদীছ আলেমগণ সংগঠনের নেতা ছিলেন। মাওলানা আরাভী একই সাথে 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স' ও জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। মাওলানা ফারকালীত ও মুহাম্মাদ সুলাইমান ছাবির বছরের পর বছর জমঈয়তের মুখপত্র 'আল-মাঈয়াহ' (المعية) পত্রিকায় ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নিদ্রামগ্ন মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করেছেন। মূলত আহলেহাদীছ ও হানাফী উভয় ঘরানার আলেমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অথচ পরে হানাফী আলেমগণ এটাকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে *(বিস্তারিত আলোচনা দ্র. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী, 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দ কী তাসীস মেঁ ওলামায়ে আহলেহাদীছ কা বুনিয়াদী কিরদার', মাসিক 'মুহাদ্দিছ' (উর্দূ), জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ২৬/৬ সংখ্যা, জুন ২০০৮, পৃঃ ২১-২৫; হাকীম মাহমূদ আহমাদ, ওলামায়ে দেওবন্দ কা মাযী (লাহোর : ইদারা নাশরুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ, ২০০৩), পৃঃ ২৯-৩০; মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদিম সোহদারাভী, সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৭০-৭২)*।-অনুবাদক।

মুজাহিদীন-এরও অনেক বড় সাহায্যকারী ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও মানুষ অবগত আছে। 'তাহরীকে রেশমী রূমাল' বা 'রেশমী রুমাল আন্দোলনে'ও এঁরা শামিল ছিলেন।[৮২]

---

৮২. ১৯১৪ সালের পর মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী এ আন্দোলন শুরু করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। যদিও ব্রিটিশ নথিপত্রে এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাওলানা মাহমূদুল হাসানকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও তাদের কর্মী বলা হয়েছে। কিন্তু দেওবন্দীরা তাঁকেই এর প্রতিষ্ঠাতা বলে থাকে। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা যেই হোক না কেন এতে দেওবন্দের সকল আলেমের নিরঙ্কুশ সমর্থন ছিল না। কারণ মাওলানা মাহমূদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা আযীয গুল ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছাড়া অন্য কোন দেওবন্দী আলেমের নাম ব্রিটিশ নথিতে পাওয়া যায় না। **এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে-** ১ম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠলে ভারতের সেনা ছাউনীগুলো একেবারে খালি হয়ে যায়। ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সৈন্যদেরকে ইরাক, ফিলিস্তীন, সাইপ্রাস ও আশপাশের দেশগুলোতে তুর্কীদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সুযোগে চামারকান্দের মুজাহিদ নেতারা বিশেষত মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী ও মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর লাহোরী জার্মান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে কাবুলে তাদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের অনুরোধ জানায়। যাতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়। কাবুলে জার্মান মিশন ব্যর্থ হলেও সেখানে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জামা'আতে মুজাহিদীন-এর সদস্যবৃন্দ হিন্দুস্তানের বড় বড় রাজ্যের রাজা ও নওয়াবদের কাছে জার্মান রাষ্ট্রদূতের চিঠি পৌঁছিয়ে দিবেন। যাতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানী বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতে আক্রমণ করলে এখানকার রাজা ও নওয়াবরা বেঁকে না বসেন। এ চিঠিগুলো রেশমী রুমালে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এ আন্দোলনের নাম হয়েছিল 'তাহরীকে রেশমী রূমাল'। মূলত এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশকে এদেশ থেকে উৎখাতের জন্য উছমানীয় তুর্কী খলীফা, জার্মানী ও আফগানিস্তানের নিকট থেকে সাহায্য লাভ করা। একটি জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল এর লক্ষ্য। এজন্য এতে শিখ ও হিন্দুরাও শামিল ছিল। সেকারণ একে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলা যায় না। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হওয়ার কারণে এতে বহু আহলেহাদীছ অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী, মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, মৌলভী আব্দুল হক, মাওলানা আব্দুল করীম (জিহাদ আন্দোলনের আমীর), আব্দুল খালেক, হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী, আব্দুল্লাহ শেখ (শিয়ালকোট), আব্দুল লতীফ, আব্দুল মজীদ, মাওলানা আব্দুল কাদের ক্বাছূরী, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুস সালাম ফারূকী (দিল্লীর প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ প্রেস ফারূকী-এর মালিক), মাওলানা আব্দুর রহীম

(লাহোরের চীনাওয়ালী জামে মসজিদের সাবেক ইমাম), মৌলভী আব্দুর রহীম আযীমাবাদী, মাওলানা ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদী, মাওলানা মহিউদ্দীন কাছূরী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কাছূরী, মুহাম্মাদ আসলাম, মুহাম্মাদ এলাহী (ফযলে এলাহী ওয়াযীরাবাদীর ভাই), নাযীর আহমাদ কাতিব, রশীদুল্লাহ (ঝাণ্ডার পীর), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মৌলভী অলি মুহাম্মাদ ফাতূহীওয়ালা ওরফে মৌলভী মূসা, নওয়াব যমীরুদ্দীন আহমাদ-এর নাম ব্রিটিশ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে *(হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, তাহরীকে জিহাদ : জামা'আতে আহলেহাদীছ আওর ওলামায়ে আহনাফ (গুজরানওয়ালা-পাকিস্তান : নাদওয়াতুল মুহাদ্দিছীন, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খ্রিঃ), পৃঃ ৭৮-৮০)*।

পূর্ণ বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা ও দূরদর্শিতার সাথে আহলেহাদীছ আলেম ছূফী আব্দুল্লাহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৭টি চিঠি নেপাল, জয়পুর, যোধপুর-এর মহারাজা এবং গোয়ালিয়র, অন্ধ্রপ্রদেশ-এর রাজা ও ভাওয়ালপুরের নওয়াবের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। ১টি চিঠি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও শওকত আলীর (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) নিকট পৌঁছিয়ে তাঁদেরকে সেটি রামপুরের নওয়াবের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে মাত্র একটি চিঠি প্রদান করা হয়েছিল মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে। তিনি সেটি নওমুসলিম আব্দুল হকের হাতে দিয়ে মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা বলেন। যাতে তিনি পত্রটি মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু মুলতান ছাউনী স্টেশনে খান বাহাদুর রব নওয়ায খান তাঁর নিকট থেকে চিঠিটি হস্তগত করে পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ওডওয়ার (Michael Oddware)-কে দিয়ে দেন। ফলে সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায়। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর শিষ্য ক্যাপ্টেন যাফর আহসান স্বীয় আত্মজীবনী 'আপবীতী'-এ উল্লেখ করেছেন যে, 'এ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ আব্দুল হক পুলিশে চাকরি পায় আর খান বাহাদুর রব নওয়ায পান নগদ অর্থ'। তিনি এটাও বলেছেন যে, 'আব্দুল হক আমাদের নিকট গোয়েন্দা হিসাবে এসেছিল' *(ওলামায়ে দেওবন্দ কা মাযী, পৃঃ ২৪৬-২৪৭)*। ব্রিটিশ নথিতে ১৩ জন বিশ্বাসঘাতকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যারা ইংরেজ সিআইডির নিকট তথ্য ফাঁস করে এ আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমনকি মাওলানা মাহমূদুল হাসানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও তাঁর হিজায সফরের সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীও ইংরেজদের জিজ্ঞাসাবাদে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। দেওবন্দী আলেমগণের কারণেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। দেওবন্দী আলেমগণ একে তাদের একক কৃতিত্ব বলে দাবী করেন, যা প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করার শামিল *(মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ আসলাম সায়েফ ফীরোযপুরী, তাহরীকে আহলেহাদীছ তারীখ কে আয়েনে মেঁ (লাহোর : মাকতাবা কুদ্দূসিয়া, ২০০৫), পৃঃ ২৮৪-২৮৭; তাহরীকে জিহাদ, পৃঃ ৭৩-৮৪; Maulana Muhammad Miyan, Silken Letters Movement, Translated by: Muhammadullah Qasemi (Deoband : Shaikhul Hind Academy, 2012) p. 49.)*।-অনুবাদক।

এ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে বহু আহলেহাদীছ ওলামা ও নেতৃবৃন্দের নাম লিখিত আছে। সীমান্ত প্রদেশের ‘খোদায়ী খিদমতগার জামা‘আতে’ও অসংখ্য আহলেহাদীছ সক্রিয় ছিলেন এবং কারাবন্দী হয়েছিলেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়। অতএব এখানেই এ বিষয়ে আলোচনার ইতি টানছি। শুধু এটা উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আহলেহাদীছ জামা‘আত সর্বদা সক্রিয় ভূমিকায় ছিল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

আরবী সাহিত্য

উপমহাদেশের মাটিতে অসংখ্য আলেম ও মুহাক্কিক জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চল আরব ভূমি থেকে হাযার হাযার মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তথাপি এখানকার মানুষেরা আরবী ভাষাকে নিজস্ব ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং এ ভাষায় এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যে, খোদ আরবরা এতে দারুণভাবে বিস্মিত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম ও গ্রন্থকার মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবরাবাদী বলতেন, অবিভক্ত ভারতে তিনজন খ্যাতিমান আরবী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনজনই ওহাবী (অর্থাৎ আহলেহাদীছ)। তাঁরা হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী, মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরী বেনারসী ও আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান। অর্থাৎ উপমহাদেশে আহলেহাদীছগণের ভাগ্যে এই মর্যাদা জোটে যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাদের আলেমগণ সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত আমার প্রিয় বন্ধু মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী (কুয়েত) আমার নিকট প্রেরণ করেন। এজন্য আমি তাঁর অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাজন। তার পক্ষ থেকে এ জাতীয় ইলমী সহযোগিতার ধারা এই অকিঞ্চনের জন্য অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

২০০৩ সালের ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী আলীগড়ে মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান সম্পর্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে ভারতের অনেক শিক্ষাবিদ আরবী, উর্দূ ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর এই প্রবন্ধগুলো 'আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানী : হায়াত ওয়া খিদমাত' শিরোনামে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের পক্ষ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি ৫৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী। ২০০৭ সালের জুনে মাওলানা রফীক আহমাদ রাঈস সালাফী যেটি আলীগড় থেকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি থিসিস আমার সামনে রয়েছে। যেটি মুহতারামা ফারযানা লতীফ লিখেছেন এবং আমাদের বন্ধু যিয়াউল্লাহ খোখার নিজ প্রতিষ্ঠান নাদওয়াতুল মুহাদ্দিছীন, গুজরানওয়ালার পক্ষ থেকে প্রকাশ করেছেন। গুজরানওয়ালায় খোখার ছাহেবের অনেক বড় লাইব্রেরী আছে। তিনি ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। দু'শ পৃষ্ঠার বেশী এই থিসিসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে খোখার ছাহেব বড় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে সুখে রাখুন!

এবার আসুন সামনে উপমহাদেশের এই তিনজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আরবী সাহিত্যিকের জীবনী লক্ষ্য করুন! সংক্ষেপে এই জীবনীগুলো লেখা হয়েছে।

১. মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী :

মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী ভারতের গুজরাট প্রদেশের 'সুরাট' শহরের একটি গ্রাম 'সামরূদ'-এ ১৩০৭ হিজরীতে (১৮৮৬ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ আব্দিল্লাহ। পিতার নাম ছিল মুহাম্মাদ ইউসুফ। তাঁর বংশতালিকা দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে। এই দিক থেকে তিনি ফারূকী অর্থাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বংশধর। সামরূদে তাঁর জন্ম হলেও সুরাটে দীর্ঘদিন থাকার কারণে সামরূদীর পরিবর্তে সুরাটী বলা হত।

তাঁর প্রিয় ছাত্র জনাব রাঈস আহমাদ জা'ফরী 'দীদ ওয়া শুনীদ'-এ তাঁর দৈহিক গঠন এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন- 'ডাগর ডাগর চোখ, বক্ষ হাদীছে নববীর ভাণ্ডার, মস্তিষ্ক নবী (ছাঃ)-এর ভাষার (আরবী ভাষার) কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের প্রাচুর্যের (بسطة فى العلم والجسم) বাস্তব প্রতিচ্ছবি'।

প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী গোলগাল, সুডৌল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাক পরিধান করতেন। গ্রীষ্মের সময় পাঞ্জাবী-পায়জামা এবং শীতের সময় আচকান যোগ করতেন'।

মাওলানার পুত্র আব্দুর রহমান তাহের সুরাটী লিখছেন, 'মুহাম্মাদ সুরাটী অনেক লম্বা সাইজের পোশাক পরিধান করতেন। জামে'আ মিল্লিয়াতে খাজী (এক কালার পোশাক) পরিধানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু তিনি পরতেন

না। তিনি গান্ধী টুপির পরিবর্তে তুর্কী টুপি পরিধান করতেন। পোশাকে আতর প্রভৃতি লাগানোতে আগ্রহী ছিলেন'।

তাঁর দৈহিক গঠন সম্পর্কে ইউসুফ হুসাইন খান 'ইয়াদ্ কী দুনিয়া'তে (পৃঃ ১৬১)- লিখেছেন, 'মাথা বড়, শরীর নরম এবং হাত-পা ভারী ছিল। অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির, অকৃত্রিম, বন্ধুবৎসল, দানশীল ও সম্পদশালী ছিলেন। আপ্যায়নে ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী। সাধারণত শেরওয়ানী পরিধান করতেন, পায়জামা টাখনুর উপরে রাখতেন, মাথায় আরবদের মতো রুমাল বাঁধতেন, যার পাড় এক পাশে ঝুলে থাকত। মাথা ন্যাড়া করতেন এবং মাথায় এত চপচপে করে তেল দিতেন যে, দূর থেকে ন্যাড়া করা বুঝা যেত। এক মুষ্ঠি দুই আঙ্গুল পরিমাণ দাঁড়ি রাখতেন'।

মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী সুরাটে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ৭ বছর বয়সে নাযেরানা কুরআন খতম করেন। মাহমূদ আলম ও শায়খ আলীর কাছ থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। মৌলবী এনায়েতুল্লাহ, মৌলবী আব্দুল্লাহ প্রমুখের নিকট থেকে ফার্সী ও আরবী পড়েন। এরপর মুম্বাই গিয়ে সেখানকার এক আহলেহাদীছ মসজিদের ইমাম মৌলবী মুহাম্মাদ জা'ফরের নিকট থেকে বিদ্যা অর্জন করেন। ১৩২৫ হিজরীতে (১৯০৭ খ্রিঃ) দিল্লী যান। দিল্লীতে সাইয়িদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছের মাদরাসায় (ফটক হাবাশ খাঁ) অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর দিল্লী যাওয়ার পূর্বেই মিয়াঁ ছাহেব মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই মাদরাসায় মিয়াঁ ছাহেবের নাতি মাওলানা সাইয়িদ আব্দুস সালাম দেহলভীর দরসে হাদীছ ইলমে হাদীছ অধ্যয়নকারীদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। সেখানে আল্লামা সুরাটী হাদীছ ও ফিক্বহ-এর জ্ঞান অর্জন করেন।

প্রফেসর মুহাম্মাদ সুরূর জামে'ঈ মাওলানা সুরাটী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দিল্লীর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ি। আমাদের নিকট পাথেয় ছিল শুধু আল্লাহ্র নাম। দিল্লী পৌঁছার পর একটি মাদরাসায় ঠাঁই পেয়ে যাই। সেই দিনগুলোতে বই ক্রয় করার সাধ্য আমাদের ছিল না। আমরা এমনটা করতাম যে, যেই বইয়ের প্রয়োজন হত সেটা কপি করে নিতাম। এভাবে অধিকাংশ বইপত্র আমাদের মুখস্থ হয়ে যেত। সে সময় চাঁদনী চকের পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হত এবং রেলস্টেশনের পাশের জমিতে অনেক ছায়াদার বৃক্ষ ছিল। আমরা সারাদিন

গাছগুলোর নিচে ছায়ায় বসে কাটাতাম। পড়ায় মন না বসলে সাঁতার কাটতে চলে যেতাম। এভাবে সাঁতার কাটায় এতটাই দক্ষতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, ভরা নদীতে সাঁতার কাটতাম'।

এই গ্রন্থের লেখকের ১৯৪২ সালে গুজরানওয়ালায় মাওলানা সুরাটীর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। বড় মাথা, হৃষ্টপুষ্ট শরীর, মোটা হাত-পা, ডাগর চক্ষু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা পোষাক। মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর জামে মসজিদ চক নায়াতে এসেছিলেন। অনেক আলেম-ওলামা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তারা তাঁর নিখাদ জ্ঞানগর্ভ আলাপচারিতায় পরিতুষ্ট হচ্ছিলেন।

দিল্লীতে মাওলানা সুরাটী বিভিন্ন মাদরাসায় বহু শিক্ষকের নিকট থেকে দ্বীনী ইলম হাছিল করেন। মাওলানা আব্দুস সালামের নিকট হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর 'বুলূগুল মারাম' এবং মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর নিকট নাহু-ছরফের কতিপয় গ্রন্থ পড়েন। মাওলানা আবু সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভীর নিকট নাহুর কিছু সবক পড়েন। অনুরূপভাবে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভীর নিকট কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শায়খ আবু ইসমাঈল ইউসুফ হুসাইন খানপুরীর নিকট আলফিয়া, সাব'আ মু'আল্লাকা ও ছন্দবিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেন।

এরপর ১৩২৭ হিজরীতে (১৯১০ খ্রিঃ) হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সেখানে আল্লামা শায়খ আবু জলীল মাক্কীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এক বছর সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এরপর তাঁর শিক্ষক শায়খ তাইয়িব মাক্কী রামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে মাওলানা সুরাটীও তাঁর সাথে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ১৩৩০ হিজরীতে (১৯১২ খ্রিঃ) শায়খ তাইয়িব নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌতে প্রধান সাহিত্যিক পদে অধিষ্ঠিত হলে জ্ঞানান্বেষী মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটীও সেখানে চলে যান। মাওলানা সুরাটী ৫ বছর শায়খ তাইয়িব মাক্কীর সাহচর্যে কাটান। শায়খ মাক্কী রামপুরে প্রত্যাবর্তন করলে মাওলানা সুরাটীও তাঁর সহযাত্রী হন। মাওলানা সুরাটী রামপুরে তাঁর নিকট মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), দর্শন, সাহিত্য, উছূলে ফিক্বহ, ইলমে কালাম (ধর্মতত্ত্ব), তাফসীর, ছহীহ বুখারী প্রভৃতি উচ্চতর কিতাবসমূহ অত্যন্ত পরিশ্রম করে পড়েন। শায়খ তাইয়িব মাক্কীর নিকট

জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করার পর মাওলানা সুরাটী বিভিন্ন খ্যাতিমান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর দরস-তাদরীসে মশগুল হয়ে যান। এ সময় তিনি শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আনছারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আল্লামা শামসুল হক ডিয়ানবীর নিকট পত্র লিখেন। অতঃপর দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ শুকরানী ও আব্দুল্লাহ সীলানীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। এরপর টোংকে পৌঁছেন। তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল কতিপয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন এবং 'আল-মুসতাদরাক' প্রভৃতি গ্রন্থ কপি করা। সেখানে তিনি সাঈদ ইরফানের নিকট অবস্থান করেন। ১৩৩২-১৩৩৫ হিজরী (১৯১৪-১৯১৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটান।

মাওলানা সুরাটী অধ্যয়নে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সব নতুন-পুরাতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। আরবী সাহিত্য ছাড়া ইতিহাস, আসমাউর রিজাল ও হাদীছ সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছিল ব্যাপক। যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন জ্ঞানের সমুদ্র প্রবাহিত করে দিতেন। তিনি আরবীর অতুলনীয় পণ্ডিত, মুহাক্কিক এবং আরবী গ্রন্থাবলীর খ্যাতিমান সমালোচক ছিলেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন।[৮৩] কোন গ্রন্থ একবার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর মৃত্যুতে সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী মাসিক 'মা'আরিফ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য, রিজাল বা রাবীদের জীবনী, কুলজি ও ইতিহাসে আল্লামা সুরাটীর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে, এই যুগে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। যে বই পড়তেন তাই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। শত শত দুর্লভ আরবী কাছীদা (দীর্ঘ কবিতা), হাযার হাযার আরবী কবিতা ও কুলজি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁকে দেখে বিশ্বাস হত যে, প্রাথমিক হিজরী শতাব্দীগুলোতে আলেম, সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিছগণের ধীশক্তির যেসব দুর্লভ দৃষ্টান্তসমূহ ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপে সঠিক'।[৮৪]

মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান বলেছেন যে, 'তিনি আরবী বললে তাঁর উচ্চারণভঙ্গি ঠিক আরবদের মতো হত। একদা তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে আলোচনা করছিলেন আর আরবরা তাঁর আলোচনা ও সুস্পষ্ট বাকভঙ্গি দেখে

---

৮৩. বিবাহের পর নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি মাত্র ৩ মাসে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন *(দ্র. ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর ২০১১, পৃঃ ৩৯)*।-অনুবাদক।
৮৪. মাসিক 'মা'আরিফ', আযমগড়, সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

বিস্ময়াভিভূত হচ্ছিল। কতিপয় আরব আলেম তাঁকে জিজ্ঞেস করেই বসেন, আপনি কি হিজাযী, ইয়ামনী না আরবের অন্য কোন এলাকার অধিবাসী? তাঁদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, ইনি হিন্দুস্থানী'।

হেকিম সৈয়দ সাঈদ আহমাদ ছাহেবের মেয়ের সাথে মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটীর বিবাহ হয়েছিল। যিনি ছিলেন ভারতের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। মাওলানা সুরাটীর সারাজীবনটা জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। যেসব মাদরাসায় তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১. জামে'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ : ১৯২০ সালের ২৯শে অক্টোবর মাওলানা মাহমূদ হাসান আলীগড়ে জামে'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ-এর উদ্বোধন করেছিলেন। সূচনালগ্নেই মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী এখানে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৮৫] পরবর্তীতে জামে'আকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানেও তাঁর পাঠদান অব্যাহত ছিল। কিন্তু তিনি বেশী দিন জামে'আ মিল্লিয়াতে থাকেননি।

২. জামে'আ রহমানিয়া বেনারস : ১৮৮৫ সালে হাফেয আব্দুর রহীম, হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব, হাফেয আব্দুর রহমান ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি 'মিছবাহুল হুদা' নামে বেনারসে একটি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। মাওলানা আব্দুর রহমান ব্যক্তিগত খরচে ১৯৩২ সালে এই মাদরাসাটিকে বেনারসের মদনপুরা মহল্লার সুরম্য বিল্ডিংয়ে স্থানান্তর করে তার নাম রাখেন 'জামে'আ রহমানিয়া'। যেসব যোগ্য শিক্ষক এখানে পাঠদান শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটীও ছিলেন। মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ও মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী আমলুবীও এখানে পড়াতে থাকেন।

৩. দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী : মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীর উৎসাহে ১৯২১ সালে এই দারুল হাদীছ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দুই ভাই শায়খ আব্দুর রহমান ও শায়খ আতাউর রহমান। এই দুই ভাই এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের যিম্মাদার ছিলেন। এখানে ছাত্রদের থাকা-

---

৮৫. মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী জামে'আ মিল্লিয়াতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক ছিলেন। জামে'আর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হেকিম আজমাল খাঁ তাঁকে এখানে এনেছিলেন। তিনি এখানে ৯ বছর পাঠদান করেন *(দ্র. ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর ২০১১, পৃঃ ৪৩)*।-অনুবাদক।

খাওয়ার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত ছিল। এই মাদরাসায় কিছুকাল মাওলানা সুরাটীর পাঠদান অব্যাহত ছিল।

৪. **জামে'আ আ'যম :** ১৩৩৫ হিজরীতে (১৯১৭ খ্রিঃ) আব্দুল হক তেযাবওয়ালা দিল্লীর বিল্লীমারা মহল্লায় এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এই মাদরাসায় কয়েকবার আসেন। এখানে মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী ছাত্রদেরকে আরবী ও ইংরেজী পড়াতেন।

৫. **দারুল হাদীছ মুম্বাই :** ১৯৩৮ সালে এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাওলানা সুরাটী একবার মুম্বাই সফর করলে ওখানকার আহলেহাদীছগণ তাঁকে এখানে থাকার অনুরোধ জানান। মাওলানা সুরাটী এই মাদরাসায় কুরআন, হাদীছ ও আরবী সাহিত্যের পাঠদান শুরু করেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন সময়ে পাঁচ বা ছয়টি মাদরাসায় পাঠদান করেন।

জ্ঞানার্জন ও পাঠদান ছাড়াও মাওলানার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের দারুণ আগ্রহ ছিল। তিনি পুরাতন গ্রন্থাবলীর সন্ধানে লাইব্রেরীগুলোতে যাতায়াত করতেন। কোথাও দুর্লভ জিনিস পেলে সেটা ক্রয় করে নিতেন। অধ্যয়নের সময় সেটি সংশোধনও করতেন। বড় বড় সরকারী গ্রন্থাগারগুলো তাঁর নিকট থেকে এই দুর্লভ কপিগুলো ক্রয় করে নিত। মাওলানা বই প্রেমিক ছিলেন। বই-পত্র সংগ্রহে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যে বই পছন্দ হত সেটা ক্রয় করতেন। কোন কারণে ক্রয় করতে না পারলে সেটি কপি করে নিতেন। বইপত্রের খোঁজে টোংকে আসলে এখানে তাঁর বিবাহও হয়ে যায়। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য তিনি টোংক, রামপুর, পাটনা, কলকাতা এবং হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) দূর-দূরান্তের শহরগুলোতে সফর করতেন। হেকিম আজমাল খাঁ মাওলানা সুরাটীর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর ইঙ্গিতেই তিনি জামে'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ-তে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মাওলানা শারঈ বিধি-বিধানের কঠিন পাবন্দ ছিলেন। সামান্য বেয়াদবীও তাঁর জন্য অসহ্য ছিল। ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। সবাই তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিল। মাওলানার ভর্ৎসনায় তাদের মাথা নত হয়ে যেত। মাওলানা তাঁর ছাত্রদেরকে যে সবক পড়াতেন সেটি পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতেন। যতক্ষণ না তা ছাত্রদের মনে প্রোথিত হয়ে যেত। সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী মাওলানা সুরাটীর শিক্ষাদান পদ্ধতিকে এভাবে

বর্ণনা করেছেন- 'জাহেলী যুগের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা তাঁর বেশি পছন্দ ছিল। জামে'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ, আলীগড় ও জামে'আ রহমানিয়া বেনারসে তিনি পাঠদান অব্যাহত রাখেন। তাঁর সাহিত্য ও কাব্যরুচি বর্তমান যুগের মিসরীয় ও সিরীয় সাহিত্য সমালোচকদের সাথে অনেকটাই মিলে যেত'। মাওলানা সুরাটী পড়াশোনার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতেন, কিন্তু ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালবাসাও ছিল অপরিসীম।

এক সময় ড. আল্লামা ইকবালের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সর্বজনবিদিত ছিল। তিনিও মাওলানা সুরাটীর অপরিসীম ইলমী যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিলেন। যখন তাঁর নিকট তাঁর ইংরেজী বক্তব্যগুলোর উর্দূ অনুবাদ করার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি সাইয়িদ নাযীর নিয়াযীর নামে লিখিত একটি পত্রে বলেন, 'সুরাটী ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনাকে অনুবাদ সম্পর্কে বিশেষ করে পরিভাষাসমূহের অনুবাদের ব্যাপারে অনেক প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন'। এই পত্রের জবাবে সাইয়িদ নাযীর নিয়াযী ইকবালকে লিখেন, 'বক্তব্যগুলোর অধিকাংশ বাক্য আল্লামা মুহাম্মাদ সুরাটীকে পড়ে শুনানো আমার রীতি ছিল'।[৮৬]

প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূমের বর্ণনা হল- 'মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মাওলানা সুরাটীর নিকট এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, তিনি যেন শাহ অলিউল্লাহ দেহলভীর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর উর্দূ অনুবাদ করেন। মাওলানা আযাদের অবগতিতে এই বিষয়টি ছিল যে, হুজ্জাতুল্লাহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সংবলিত গ্রন্থ। এজন্য হুজ্জাতুল্লাহর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রেক্ষিতে মাওলানা সুরাটীর জ্ঞানগত মর্যাদা এ কথার নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, তিনি এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও বোধগম্য অনুবাদ করবেন'।

নিঃসন্দেহে মাওলানা সুরাটী স্বীয় যুগের একজন বড় আলেমে দ্বীন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, ধর্মীয় বিষয়াবলীর পণ্ডিত এবং অনেক বড় আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কারণে শেষ বয়সে তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় আড়াই বছর এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ভরা যৌবনে মৃত্যুবরণ করেন। এই বিয়োগব্যথা মাওলানাকে কাবু করে দিয়েছিল। তিনি ১৩৬১ হিজরীর ২৩শে শা'বান শুক্রবার (৭ই

৮৬. সাইয়িদ নাযীর নিয়াযী, মাকতূবাতে ইকবাল, পৃঃ ৩০।

আগস্ট ১৯৪২ খ্রিঃ) আলীগড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘ঊন।

আল্লামা মুহাম্মাদ সুরাটীর ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা ছিল। তিনি বড় বড় ক্ষতি সহ্য করে নিতেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধি-বিধানের বিরোধিতা সহ্য করতেন না। তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত কট্টর ছিলেন। ধূমপান, ছবি তোলা, স্বর্ণের বোতাম ও রেশমী বস্ত্র পরিধান এবং রেডিওতে আজেবাজে জিনিস শ্রবণ করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন।

তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিল। কতিপয় ছাত্রের নাম নিম্নরূপ :

১. প্রফেসর আব্দুর রহমান তাহের সুরাটী (মাওলানার পুত্র এবং কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা)।[৮৭]

২. ড. যাকির হুসাইন (ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট)।

৩. ড. আব্দুল আলীম (লাক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। পরবর্তীতে আলীগড় ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর)।

৪. প্রফেসর মুহাম্মাদ সুরূর (খ্যাতিমান সাংবাদিক, বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক)।

৫. মাওলানা আব্দুছ ছামাদ শারফুদ্দীন (খ্যাতিমান আলেম)।

৬. রাঈস আহমাদ জা‘ফরী (খ্যাতিমান সাংবাদিক, অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক)।

৭. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-উমারী (সঊদী আরবে বড় বড় পদে সমাসীন ছিলেন)।

৮. মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান (খ্যাতিমান আলেম এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর)।

৯. ড. সাইয়িদ আব্দুল্লাহ (সাবেক চেয়ারম্যান, উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ডজন ডজন গ্রন্থের রচয়িতা)।

---

৮৭. ইনি প্রখ্যাত মিসরীয় সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার আহমাদ হাসান আয-যাইয়াতের ‘তারীখুল আদাবিল আরাবী’ গ্রন্থটি ১ম উর্দূতে রূপান্তর করেন। ১৯৬১ সালে লাহোর থেকে যেটি প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ২য় উর্দূ অনুবাদ করেন ড. তুফাইল আহমাদ মাদানী। যেটি ১৯৭৯ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।-অনুবাদক।

১০. মালিক হাসান আলী জামে‘ঈ শারকপুরী (বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও অনুবাদক)।

১১. আব্দুল আযীয নাজদী (সিন্ধী ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদক)।

মাওলানা সুরাটী অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করেন।[৮৮] তন্মধ্যে কিছু প্রকাশিত হয় এবং কিছু অপ্রকাশিত রয়ে যায়। তিনি আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানের কতিপয় লেখনীর কড়া সমালোচনা করেন। আল্লামা মাইমানও কড়া ভাষায় তাঁর জবাব দেন। সম্ভবত এতে সমসাময়িকতারই বেশি হাত ছিল।

২. আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী বেনারসী (রহঃ) :

আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী বেনারসী ১৮৯২ সালে বেনারসের এক মধ্যবিত্ত জ্ঞানবান্ধব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ৫ বছর বয়সে তাঁকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। ৯ বছর বয়সে উর্দূ, ফার্সী ও আরবী ব্যাকরণে বেশ দক্ষতা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ১৫ বছর বয়সে দরসে নিযামী শেষ করে ফারেগ হয়েছিলেন। ঐ বয়সেই এলাহাবাদ বোর্ডের ‘মোল্লা ফাযেল’ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। বয়স কম হওয়ার কারণে তাঁর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীর খাঁ এই পরীক্ষায় তাঁর সাথে বসতেন।

---

৮৮. তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কাব্য-সংকলন ‘আযহারুল আরাব’ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। জামে‘আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ (দিল্লী)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন কবির কবিতা এতে সংকলন করেন। ১৯২৪ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচীভুক্ত হয়। এখনও কিছু প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যসূচীভুক্ত রয়েছে। জামে‘আ সালাফিয়া বেনারস থেকে ২০০৬ সালে এটি মুহাম্মাদ আবুল কাসেম আবুল খায়ের সালাফীর তাহকীকসহ প্রকাশিত হয়েছে *(‘ছাওতুল উম্মাহ’, ডিসেম্বর ২০১১, পৃঃ ৪০, ৪৫)*। আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী ‘শারহু আযহারিল আরাব’ নামে এটির ব্যাখ্যা লিখেন। কিন্তু এখনো তা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। মাওলানা সুরাটী ‘কাওয়াইদে আরবী’ নামে একটি ছরফের গ্রন্থও রচনা করেন। ১৩৪২ হিজরীতে এটি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তিনি বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর ‘কিতাবুত তাওহীদ’ উর্দূতে অনুবাদ করেন। এটি ছিল এ কালজয়ী গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবাদ। প্রথম অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত আহলেহাদীছ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আব্দুল হালীম শারার (ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ ও আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদী, আহলুল হাদীছ ফী শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়াহ *(বৈরূত : দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৫ হিঃ/২০১৪ খ্রিঃ), পৃঃ ১৪, ভাট্টি লিখিত ভূমিকা দ্র.)*।-অনুবাদক।

মাওলানা হারীরী উক্ত পরীক্ষায় সমগ্র উত্তর প্রদেশে (যেটি সে সময় ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল) প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। বোর্ড তাঁকে পুরস্কৃত করে।

ইংরেজী শিক্ষার জন্য আব্দুল মাজীদ হারীরী বেনারসের জয় নারায়ণ হাইস্কুলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১ম স্থান অধিকার করেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে রেকর্ডসংখ্যক নম্বর পেয়ে এফএ পাশ করেন। বি.এ করার পর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ ও এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে যান।

যে সময় খেলাফত আন্দোলন তুঙ্গে ছিল, সেই দিনগুলোতে অসহযোগ আন্দোলনও চলছিল। সেই সময়ে তিনি আলীগড়কে বিদায় জানান এবং নিজ প্রিয় জন্মভূমি বেনারসে চলে আসেন। খেলাফত আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং এজন্য একবার জেলেও যান। তিনি সর্বদা কংগ্রেসের সাথে ছিলেন। শেষ বয়সে রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করে নির্জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন। এলএলবি পাশ করার পর ওকালতি শুরু করেছিলেন। ওকালতি বেশ চলেছিল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে এই পেশা এজন্য ছেড়ে দেন যে, 'এতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিথ্যা, ধোঁকাবাজি, বেঈমানী ও বাটপারির মাধ্যমে কাজ করতে হয়। কোন ভদ্র লোকের জন্য এই পেশা উপযোগী নয়'। একথা বলে তিনি এই পেশা থেকে দূরে সরে যান।

আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী বই পড়ায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাত-দিন পড়াশোনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে তিনি নিজের পছন্দের অনেক বই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি মারকাযী দারুল উলূম বেনারসের মালিকানাধীন রয়েছে। যার দ্বারা ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ পাঠক উপকৃত হচ্ছেন। মাওলানা হারীরী মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে দারুল উলূম বেনারসে লাইব্রেরীটি হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন।

মাওলানা মাসঊস আলম নাদভী যখন তাঁর 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এক মাযলূম আওর বদনাম মুছলেহ' ও 'হিন্দুস্তান কী পহেলী ইসলামী তাহরীক' গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তিনি ঐ গ্রন্থাগার থেকে অনেক উপকৃত হয়েছিলেন।

মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরী অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি আলেমগণের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলেন। দেশী-বিদেশী কোন আলেম যখন বেনারসে আসতেন, তখন তিনি মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীর মেহমান হতেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী, মাওলানা আব্দুল আযীয মাইমান, মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী, ড. যাকির হুসাইন খান (সাবেক প্রেসিডেন্ট, ভারত), রফী আহমাদ কিদওয়াঈ এবং দেশের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে মাওলানা হারীরীর গভীর সম্পর্ক ছিল।

দেশের (ভারত) স্বাধীনতার পর মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যখন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাস সংস্কার কল্পে একটি কমিটি গঠন করেন, তখন মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীকে তার সদস্য নিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক ও জ্ঞানগত দু'দিক থেকেই মাওলানা আযাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা হারীরীর বিদ্যাবত্তা এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য দক্ষতার উপর মাওলানা আযাদের অত্যন্ত আস্থা ছিল। সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী এবং মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী যখনই বেনারসে এসেছেন, মাওলানা হারীরীর বাড়িতেই তাঁরা অবস্থান করেছেন।

মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরী ৭টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভাষা ৭টি হল- উর্দূ, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও তুর্কী। এগুলোর প্রত্যেকটিতে কথোপকথনে দক্ষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক ভাষাভাষীর বাকরীতিতে কথা বলতেন। ইংরেজী বলার সময় ইংরেজদের মতো বলতেন। আর আরবী বলার সময় এমনটা মনে হত যে, তিনি খাঁটি আরব বাসিন্দা। ফার্সীতে কথা বললে ফার্সীর অনেক বড় ইরানী পণ্ডিত ও সাহিত্যিক মনে হত। আরবী বলা ও লেখায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী একবার মাওলানাকে বলেন, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আপনি যতটা যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, অদ্যাবধি আমি সেই স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হইনি'।

সিরিয়ার একজন প্রখ্যাত আলেম শায়খ আব্দুল আযীয ছা'আলাবী একবার ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতে আসলে বেনারসে মাওলানা হারীরীর বাড়িতে অবস্থান করেন। তিনি মাওলানা হারীরীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। তিনি মোটেই বুঝতে পারছিলেন না যে, ইনি আরব না হিন্দুস্তানী আলেম। তিনি

মাওলানা হারীরীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কতদিন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে (মিসর) পড়েছেন? মাওলানা হারীরী জবাব দেন, আমি পড়ার জন্য মিসরে যাইনি। আমি আরবীর যাবতীয় তা'লীম নিজ দেশেই গ্রহণ করেছি। আরবী শেখার জন্য আমি ভারতের বাইরে যাইনি। আল্লামা ছা'আলাবী বলতে শুরু করেন, আপনার ভাষা ও উচ্চারণভঙ্গি শুনে এটা অনুভূত হচ্ছে যে, কোন ব্যবসায়িক কারণে আপনি ভারতে অবস্থান করছেন। আসলে আপনি আরবের অধিবাসী। মাওলানা হারীরী এত সাবলীলভাবে আরবী বলছিলেন যে, তাঁর ভারতীয় না হওয়া এবং আরব হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ছা'আলাবী ভ্রমে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লামা হারীরীর শিক্ষক আল্লামা মুহাম্মাদ মুনীর খাঁ যখন আল্লামা ছা'আলাবীকে নিশ্চিত করলেন যে, ইনি আমার ছাত্র এবং তিনি আমার নিকট থেকে যাবতীয় আরবী তা'লীম গ্রহণ করেছেন, তখন আল্লামা ছা'আলাবীকে বিশ্বাস করতে হয়।

আল্লামা ছা'আলাবী তাঁর বিজ্ঞতা ও জ্ঞানপ্রিয়তার ভিত্তিতে মাওলানা হারীরীকে বললেন যে, আমার এক আরব বন্ধু আছে। যিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বর্তমানে তিনি প্রবাস জীবন যাপন করছেন। আপনি অনুমতি দিলে তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইনি ছিলেন আল্লামা তাকিউদ্দীন হেলালী মার্রাকুশী। মাওলানা হারীরী সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং আল্লামা ছা'আলাবীকে আন্তরিকভাবে বলেন যে, তাঁকে অবশ্যই আমার নিকট বেনারসে পাঠিয়ে দিন। আল্লামা তাকিউদ্দীন হেলালী মার্রাকুশী বেনারসে আসেন এবং দুই বছর হারীরী ছাহেবের নিকট মেহমান হিসাবে অবস্থান করেন। আল্লামা হারীরী তাঁর সুন্দর মেহমানদারি করেন এবং অত্যন্ত স্নেহসুলভ আচরণ করেন। দু'জনের মধ্যে ইলমী আলোচনা হত। সাহিত্যিক, নাহবী (ব্যাকরণগত) ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে মতবিনিময় হত। মাওলানা হারীরী অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লামা তাকিউদ্দীন হেলালীকে আরবী কথোপকথনে অনেক সহযোগিতা করেন। আল্লামা হেলালী মাওলানা হারীরী সম্পর্কে বলেন, 'তিনি একজন সাহিত্যিক ও মুহাক্কিক। তাঁর জ্ঞান অর্জিত ও আল্লাহ প্রদত্ত দু'টোই'।

সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী যখন অবগত হন যে, আল্লামা তাকিউদ্দীন হেলালী মার্রাকুশী মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীর মেহমান, তখন তিনি তাঁকে

লিখেন, আরবী পাঠদানের জন্য আল্লামা হেলালীকে দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামায় (লাক্ষ্ণৌ) পাঠিয়ে দিন। আল্লামা হেলালী সুদৃঢ় আক্বীদা সম্পন্ন একজন আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। এজন্য তিনি নাদওয়ায় যাওয়া পছন্দ করেননি যে, হয়ত সেখানে আমার কারো সাথে পড়তা পড়বে না। কিন্তু মাওলানা হারীরীর জোরাজুরিতে তিনি আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌয় যান।[৮৯] এটা বলা অসংগত হবে না যে, যদি আল্লামা হিলালী মার্রাকুশী নাদওয়ায় না যেতেন তাহলে মাওলানা মাসঊদ আলম নাদভী এবং সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভীর এত সুনাম ও সুখ্যাতি হত না। নাদওয়াওয়ালাদের প্রতি এটা মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীর অনুগ্রহ। কিন্তু এই পার্থিব জগতে এ ধরনের অনুগ্রহ কে মনে রাখে? যারা তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হন তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর কেচ্ছা খতম হয়ে যায়। আল্লামা হারীরী যতদিন জীবিত ছিলেন, আল্লামা হিলালী ছুটির দিনগুলো বেনারসে কাটাতেন।

আল্লামা মূসা জারুল্লাহ রুশী রুশ বিপ্লবের পরে দেশ থেকে বহিস্কৃত হলে তিনি বেনারসে মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীর মেহমান ছিলেন। মাওলানা হারীরী তাঁর নিকট থেকে তুর্কী ভাষা শেখেন। মাওলানা মুহাম্মাদ সুরাটী যখন মাওলানা হারীরীকে পত্র লিখতেন তখন الفاضل المجيد والظريف الوحيد الأستاذ। (সম্মানিত আলেম ও অনন্য মেধাবী প্রফেসর) এবং আল্লামা মূসা

৮৯. ১৯৩০ সালে আল্লামা হেলালী (মৃঃ ১৪০৭ হিঃ) নাদওয়াতুল ওলামায় যান এবং প্রধান সাহিত্যিক পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে তিনি ৩ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সাইয়িদ সুলাইমান নাদভীর প্রস্তাবে ১৯৩২ সালে 'আয-যিয়া' নামে একটি আরবী পত্রিকা বের করেন (ড. মুহাম্মাদ আকরাম নাদভী, আবুল হাসান আন-নাদভী *(দামেশক : দারুল কলম, ১৪২৭ হিঃ/২০০৬ খ্রিঃ), পৃঃ ৭৭)*। আবুল হাসান নাদভীকে লিখিত এক পত্রে হেলালী বলেন, 'ভারতে আরবী ভাষা না জানার কারণেই কাদিয়ানী, কুরআন অনুসরণের মিথ্যা দাবীদার (আহলে কুরআন), ব্রেলভী প্রভৃতি ভ্রান্ত ফেরকা জন্মলাভ করেছে। এজন্য কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সঠিকভাবে আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য আমি তোমাদের মাঝে কয়েক বছর ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেছি। আমি এর চেয়েও বেশী সময় তোমাদের মাঝে অবস্থান করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। যদি না অল্প সময়ে পনের বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতাম *(ঐ, পৃঃ ৭৯-৮০)*।-অনুবাদক।

জারুল্লাহ যখন তাঁকে পত্র লিখতেন তখন الأديب المجيد (সম্মানিত সাহিত্যিক) জাতীয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করতেন।

মাওলানা হারীরী বলিষ্ঠ খতীব এবং সুবক্তাও ছিলেন। আলোচনা করার সময় তাঁর মুখ থেকে সুন্দর শব্দগুচ্ছ বের হত। আরবী ছাড়া তাঁর উর্দূ লেখনী ও বক্তব্যও খুব সুন্দর ছিল। কারণ উর্দূ ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাঁর হাযার হাযার ফার্সী ও আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল। নিজ বক্তব্যের উপযুক্ত স্থানে কবিতা ব্যবহার করতেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন।

১৯৪৯ সালে ভারত সরকার মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরীকে জেদ্দায় ভারতের কাউন্সিলর নিযুক্ত করেন। মাওলানা মিসর হয়ে জেদ্দা গমন করেন এবং দু'দিন মিসরে অবস্থান করেন। সেখানকার ওলামায়ে কেরাম ও শায়খদের সাথে আলোচনা করেন। আযহারের ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আহমাদ আল-মামূন আল-শানাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাথে আলাপ হয়। প্রসিদ্ধ মিসরীয় প্রফেসর শায়খ আলী মোস্তফা আল-গার্রাবীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

জেদ্দা গমনের পর আল্লামা হারীরী মদীনা মুনাউওয়ারায় যান। তিনি মদীনা মুনাউওয়ারার একটি বাজারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি অবগত হন যে, ফিলিস্তীনের গ্র্যান্ড মুফতী আল্লামা সাইয়িদ আমীন আল-হুসাইনী এখান দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হারীরী ছাহেবকে চিনতে পারেন। গ্র্যান্ড মুফতী রাজকীয় মেহমান ছিলেন। তিনি মাওলানাকেও তাঁর সাথে তাঁর অবস্থানস্থলে নিয়ে যান। ওখানে আরব রাষ্ট্রগুলো থেকে আগত অনেক আলেম-ওলামা ও গুণীজনের সমাগম ছিল। মাওলানা হারীরীর সামান্য আলাপচারিতায় তাঁরা এতটাই প্রভাবিত হন যে, তাঁর বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি প্রদান করতে শুরু করেন।

শাহ সঊদ ঐ সময় হিজাযের শাসক ছিলেন। তাঁর দাওয়াতে মাওলানা হারীরী রিয়াদে যাত্রা করেন। শাহ সঊদের নির্দেশে হারীরী ছাহেব তাঁর রাজকীয় লাইব্রেরী সাজান। মাওলানা হারীরী যখন লাইব্রেরীর সজ্জায়ন ও বিন্যস্তকরণ শেষ করেন, তখন তাঁর সম্মানে শাহ সঊদের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টা ও শহরের মেয়রগণ ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা যখন ঐ গ্রন্থাগার বিন্যস্তকরণ সম্পর্কে বলেন

তখন চতুর্দিক থেকে أَحْسَنْتَ، مَرْحَبًا ‘ভাল করেছেন, স্বাগতম’ ধ্বনি গুঞ্জারিত হতে শুরু করে।

আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। অবশ্য বেনারসের এক মুফতীর (যিনি হানাফী আলেম ছিলেন) জবাবে বেনারসের আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল মতীন রচিত পুস্তিকা ‘নামাযে জানাযা আনদরূন মসজিদ’ (মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত)-এর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিস্তৃত অভিমত লিখেছিলেন। এছাড়া ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত ‘মুমিন কনফারেন্সে’ সভাপতিত্ব করেন। এরপর ১৯৩৯ সালে ঐ সংগঠনেরই কলকাতার কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ সালে তিনি লাক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ‘ইউপি আযাদ মুসলিম কনফারেন্সে’ স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন। এই তিন কনফারেন্সের স্বাগত ভাষণগুলো উর্দূতে প্রদত্ত। যেগুলো কোন এক সময়ে মুদ্রিতও হয়েছিল। ঐ বক্তব্যগুলোর ভাষা অত্যন্ত মাপাজোখা ও সাহিত্যিক মান সমৃদ্ধ। যেগুলো সবাই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারে।

আল্লামা হারীরী আবু হুরায়রা (রাঃ) মুনছারিফ ও গায়ের মুনছারিফ হওয়া সম্পর্কে আরবী ভাষায় একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। তিনি ‘খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’ বিষয়েও আরবীতে একটি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

মাওলানা আব্দুল মাজীদ হারীরী বাল্যকাল থেকেই ইবাদত ও যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা)-এর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং এ বিষয়ের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রিয় সখ। অধিকাংশ সময় দো‘আ-দরূদ, আল্লাহ্‌র যিকর ও কুরআন তেলাওয়াতে অতিবাহিত হত। শেষ জীবনে ঘর থেকে মসজিদ এবং মসজিদ থেকে ঘর পর্যন্ত নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন।

আল্লামা আব্দুল মাজীদ হারীরী নামে অভিহিত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এই উজ্জ্বল তারকা ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৮০ বছর বয়স পেয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চিরস্থায়ী নিবাসে যাত্রা করেন। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে ক্ষমা কর এবং তাঁর প্রতি দয়া কর।

৩. আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান :

১৮৮৮ সালের অক্টোবরে ‘রাজকোট’ (গুজরাট, ভারত) নামক স্থানে আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বারদোয়ালীর

(কাঠিয়াওয়ার) অধিবাসী ছিলেন। যারা কোন এক সময়ে সিন্ধু প্রদেশ থেকে হিজরত করে সেখানে বসবাস শুরু করেছিলেন। এটা ব্যবসায়ী পরিবার ছিল। নিজ বাসস্থান রাজকোটে আব্দুল আযীয মাইমান পড়ালেখা শুরু করেন। নাযেরানা কুরআন মাজীদ খতম ও কতিপয় উর্দূ গ্রন্থ পড়ার পরে পিতা ছেলেকে জুনাগড়ে পাঠিয়ে দেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। অতঃপর পিতার নির্দেশে রাজকোটে ফিরে আসেন।

পিতা পেশায় ব্যবসায়ী হওয়ার সাথে সাথে খাঁটি ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছেলেকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী ছিলেন। ঐ সময় দিল্লী জ্ঞানচর্চা ও আলেমগণের অনেক বড় কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। সেখানে দ্বীনী ইলম হাছিলের জন্য অনেক মাদরাসা চালু ছিল। যেগুলোতে প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম পাঠদানের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তাই পিতা পুত্রকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। এটা ১৯০১ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকের কথা। ঐ সময় মাইমান ছাহেব ১৩ বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। সেখানে তিনি কতিপয় আরবী ও ফার্সী কিতাব পড়েন। উপরন্তু নাহু-ছরফের (আরবী ব্যাকরণ) ছোট-বড় গ্রন্থগুলো শেষ করেন। হাদীছ গ্রন্থ মিশকাতও ওখানে পড়েন। তাঁর ঐ সময়ের শিক্ষকগণের মধ্যে ডেপুটি নাযীর আহমাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভীর নাম উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা সাহসোয়ানীর নিকট থেকে তিনি তাফসীর ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন এবং অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের কিতাবসমূহও পড়েন। তিনি ডেপুটি নাযীর আহমাদের নিকট আরবী সাহিত্যের হামাসাহ, দীওয়ানে আবূ তাম্মাম, দীওয়ানে মুতানাব্বী, মাকামাতে হারীরী ও আল-মা'আর্রীর 'সাকতুয যান্দ' যথারীতি সবক আকারে পড়েন। তিনি তাঁর এই দুইজন শিক্ষক দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত এবং তাঁদের বিদ্যাবত্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকারী ছিলেন। ১৩২৬ হিজরীতে (১৯০৮ খ্রিঃ) মাওলানা সাহসোয়ানী মৃত্যুবরণ করলে যোগ্য ছাত্র উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের মৃত্যুতে আরবীতে হৃদয়বিদারক শোকগাথা লিখেন।

মাইমান ছাহেব অত্যন্ত মেধাবী এবং জ্ঞানার্জনে দারুণ অগ্রগামী ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে 'মুনশী ফাযেল' এবং ১৯১৩ সালে 'মৌলভী ফাযেল' পরীক্ষা দেন এবং ১ম স্থান অধিকার করেন। সেই

সময় ফাযেলে ফার্সীকে 'মুনশী ফাযেল' এবং ফাযেলে আরবীকে 'মৌলবী ফাযেল' বলা হত।

পড়াশোনা শেষ করার পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর তুখোড় মেধা ও গভীর জ্ঞানের প্রসিদ্ধি দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে তাঁর পড়াশোনা শেষ হলে ঐ বছরই তাঁকে পেশাওয়ার এডওয়ার্ড মিশন কলেজে আরবী ও ফার্সীর শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ১৯২০ সালে তিনি পেশাওয়ার থেকে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে চলে যান। এখানে মৌলভী মুহাম্মাদ শফী, মৌলভী মুহাম্মাদ নাজমুদ্দীন, সাইয়িদ মুহাম্মাদ তালহা, সাইয়িদ আওলাদ হুসাইন শাদাঁ বিলগ্রামী ও অন্যান্য অসংখ্য খ্যাতিমান আলেমের সাথে তাঁর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়।

ছাহেবযাদা আফতাব আহমাদ খাঁ আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হলে তিনি তাঁকে সেখানে ডেকে নেন। এটা ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসের কথা। তাঁকে মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে আরবী বিভাগের রীডার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান করা হয়। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে প্রফেসর পদে তাঁর নিয়োগ কার্যকর হয়। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে সমাসীন থাকেন। এখানে এটা স্মতর্ব্য যে, ইতিপূর্বে জার্মানী বা ইংল্যান্ডের কোন প্রাচ্যবিদকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হত। আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান প্রথম ভারতীয় যাকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির উক্ত পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৪৯ সালর মার্চে যখন তাঁর চেয়ারম্যানশিপের মেয়াদ শেষ হয় তখন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ড. যাকির হুসাইন খান (যিনি এর কয়েক বছর পর ভারতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন)। তিনি আল্লামা মাইমানের চাকুরীর মেয়াদ ১ বছর বাড়িয়ে দেন। এভাবে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চে তিনি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে অবসর গ্রহণের পর আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান সেখানে ৪ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর নিজ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য করাচী গমন করেন। করাচীতে তাঁর অনেক গুণগ্রাহী ও ছাত্র মওজুদ ছিল। এদের মধ্যে মুমতায হাসান, ড.

সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইউসুফ, ড. নবীবখশ বালুচ এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত মিসরীয় রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল ওয়াহ্হাব আযযামের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যেন করাচীতে থাকেন এবং ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক পদ গ্রহণ করেন সেজন্য এরা পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু করাচীর আবহাওয়া তাঁর জন্য অনুকূল ছিল না এবং এখানকার রাষ্ট্রীয় অবস্থার প্রতিও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে এটা তাঁর পছন্দসই গবেষণামূলক কাজ ছিল। এজন্য তিনি রাযী হয়ে যান। এদিকে ভারতেও তাঁর বিশাল মর্যাদা ছিল এবং আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে তিনি ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। সেখানে তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহী ছিল। 'মাইমান মঞ্জিল' নামে আলীগড়ে তাঁর বাড়িও ছিল। তিনি করাচী থেকে আলীগড় গিয়ে ওখানকার কাজ সেরে করাচী ফিরে আসেন। করাচীতে তাঁকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছিল তা ছিল তাঁর পছন্দসই নিখাদ গবেষণামূলক কাজ। তিনি ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের পরিচালক পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের মার্চে তাঁকে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

তিনি তখন ৭২ বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। সেজন্য ১৯৬০ সালের জুনে ড. ইশতিয়াক হুসাইন পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি ইন্সটিটিউটের দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। অতঃপর ১৯৬৪ সালে প্রফেসর হামীদ আহমাদ খাঁকে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হলে তাঁর পীড়াপীড়িতে তিনি লাহোরে চলে আসেন এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত পদে তিনি ২ বছর আসীন থাকেন। ১৯৬৬ সালে তিনি করাচীতে চলে যান।

১৯১৩ সালে আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান পেশাওয়ার এডওয়ার্ড মিশন কলেজ থেকে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। যেটা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং হাযার হাযার ছাত্র তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারত ও পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর পেশাওয়ারের ছাত্রদের তালিকায় সরদার আব্দুর রব নিশতার, আরবাব মুহাম্মাদ আব্বাস, মেহেরচান্দ খনা, খান আব্দুল গাফফার খানের ভাতিজা মুহাম্মাদ ইউনুস খানের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা ইমতিয়ায আলী আরশী, ড. শেখ এনায়েতুল্লাহ, ড.

আব্দুল্লাহ চুগতাঈ রয়েছেন। আলীগড়ে তাঁর নিকট থেকে অগণিত ছাত্র জ্ঞানার্জন করে। তিনি স্বীয় যুগের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্ররা সর্বদা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। তিনি ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করাকে নিজের মৌলিক দায়িত্ব মনে করতেন।

এবার মাইমুন ছাহেবের তাছনীফী ও তাহকীকী অবদানের দিকে আসুন!

আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক। তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের পরিচিতি পেশ করা হচ্ছে :

১. ইক্বলীদুল খিযানাহ (إقليد الخزانة) : হিজরী একাদশ শতকের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আব্দুল আযীয বাগদাদী 'খিযানাতুল আদাব ওয়া লুব্বু লুবাবি লিসানিল আরাব' (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যেটি একটি বিশাল গ্রন্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের চমৎকার সংকলন। আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান এই গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করেন। এতে প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন করেন এবং 'ইক্বলীদুল খিযানাহ' নামে প্রকাশ করেন।

২. **সিমতুল লাআলী ফী শারহি আমালিল ক্বালী (سمط اللآلى في شرح أمالى القالى)** : স্পেনের শাসক আব্দুল আযীয আন-নাছির (৩০০-৩৫০ হিঃ) প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু আলী আল-ক্বালীকে নিজ সন্তান হাকামের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি স্বীয় ছাত্র হাকামকে 'ইমলা' (শ্রুতলিখন) পদ্ধতিতে শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে ঐ শ্রুতলিখনগুলোকে গ্রন্থের রূপ প্রদান করে তার নাম রাখেন 'আল-আমালী লিআবী আলী আল-ক্বালী' (الأمالى لأبى على القالى)। আল্লামা মাইমান অত্যন্ত সূক্ষ্ম গবেষণা করে সেটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করেন এবং 'সিমতুল লাআলী ফী শারহি আমালিল ক্বালী' নামে প্রকাশ করেন।

৩. **আল-হামাসাতুছ ছুগরা (الحماسة الصغرى)** : আবূ তাম্মামের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-হামাসাহ' শিক্ষাঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত। যেটি অনেক কবিতার সংকলন। শত শত বছরব্যাপী এই গ্রন্থটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার কেউ চেষ্টা করেনি। আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান এর সব কবির জীবনী লিখেন এবং কবিতাগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক বর্ণনা করেন। যেসব দীওয়ান বা কাব্য সংকলন থেকে যে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছিল সেগুলো শনাক্ত করেন। প্রত্যেক রচয়িতার জীবনী লিপিবদ্ধ করেন এবং 'আল-হামাসাতুছ ছুগরা' বা ছোট হামাসা নামে সেটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

৪. **আবুল 'আলা ওয়ামা ইলাইহি (أبو العلاء وما إليه)** : আবুল 'আলা আল-মা'আর্রী (৩৫৩-৪৪৯ হিঃ) আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মিসরের খ্যাতিমান অন্ধ সাহিত্যিক তহা হুসাইন 'যিকরা আবিল 'আলা' (ذكرى أبي العلاء) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করান। যেটি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ। আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান এ গ্রন্থের এমন গবেষণা ও সমালোচনামূলক কাজ করেন এবং এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন, যার কাছে তহা হুসাইনের গ্রন্থটি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। দু'জন সাহিত্যিকের গবেষণার মানদণ্ড ও জ্ঞানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

৫. **দীওয়ানু হুমাইদ বিন ছাওর (ديوان حميد بن ثور)** : এটি হুমাইদ বিন ছাওরের ঐ সকল কবিতার সংকলন, যেগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মাইমান ছাহেব সেগুলোকে একত্রিত করেন এবং এর প্রয়োজনীয় পাদটীকা লিখেন। অতঃপর এটিকে 'দীওয়ানু হুমাইদ বিন ছাওর' নামে প্রকাশ করেন।

৬. **দীওয়ানু সুহাইম আবদি বানিল হাসহাস (ديوان سحيم عبد بني الحسحاس)** : ইনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী। তাঁর কবিতাগুলো বিভিন্ন জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লামা মাইমান সেগুলো একত্রিত করেন এবং এর প্রয়োজনীয় পাদটীকা লিখেন।

৭. **কিতাবুত তামবীহাত আলা আগালীতির রুওয়াত (كتاب التنبيهات على أغاليط الرواة)** : এটি আলী বিন হামযা মিসরীর রচনা। যিনি আব্বাসীয় যুগের প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বীর (৩০৩-৩৫৩ হিঃ) বন্ধু ছিলেন। মাইমান ছাহেব

এই গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করেন, এর চমৎকার পাদটীকা লিখেন এবং অনেক তথ্য সংযোজন করে এটা প্রকাশ করেন।

৮. **কিতাবুল মানছূছ ওয়াল মামদূদ** (كتاب المنصوص والممدود) : এটি প্রসিদ্ধ নাহবী ফার্রার রচনা। যেটি দুস্প্রাপ্য ছিল। আল্লামা মাইমান এটিকে বিন্যস্ত করে দারুল মা'আরিফ, মিসর থেকে প্রকাশ করান।

৯. **লিসানুল আরাব** (لسان العرب) : এটি প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা ইবনু মানযূর আফ্রিকীর রচনা। যেটির তাহকীক ও বিন্যাসে আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। অভিধানটি প্রাচীন ধাঁচের। এজন্য তিনি এটির ব্যবহারবিধি প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োজনীয় পাদটীকা লিপিবদ্ধ করেন। কঠিন শব্দগুলো ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য আরবী উৎসগুলোর সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপন করেন। এটি আল্লামার অনেক বড় গবেষণামূলক কাজ।

আল্লামা মাইমানের মুখস্থশক্তি অত্যন্ত জোরালো ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বিভিন্ন কবির কমবেশী ১ লাখ কবিতা মুখস্থ ছিল।[৯০] তিনি অনেক আরব ও অনারব দেশে দাওরা করেন। তাঁর পরিচিতির পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি যেখানেই যেতেন অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে স্বাগত জানান হত।

আক্বীদার দিক থেকে মাইমান ছাহেব আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার লেখনীগুলোতে তাঁর নাম 'আব্দুল আযীয আস-সালাফী আল-আছারী' লিখিত পাওয়া যায়। তিনি বা-আমল আহলেহাদীছ ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানীর ইলমী ও দ্বীনী আলোচনা এবং তাঁর সাহচর্যের কল্যাণে তাঁর আক্বীদায় বেশ দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

নিজ যোগ্য ছাত্রদের সাথে মাইমান ছাহেবের সীমাহীন ভালবাসা ছিল এবং তাঁদের উন্নতিতে তিনি প্রশান্তি অনুভব করতেন।

---

৯০. একবার আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী আল্লামা মাইমানকে তাঁর কত কবিতা মুখস্থ আছে এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ৭৫ হাযার থেকে ১ লাখ। দ্র. নাদভী, মিন আ'লামিল মুসলিমীন ও মাশাহীরিহিম *(দামেশক : দারু ইবনি কাছীর, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খ্রিঃ), পৃঃ ৩৩৫)*।-অনুবাদক।

তাঁর লাহোরে অবস্থানকালীন সময়ে এ গ্রন্থের লেখকের তাঁর সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘ গড়ন, সুন্দর চেহারা, হালকা শরীর, ছোট সাদা দাড়ি। সাদা পাঞ্জাবী, পাজামা ও শেরওয়ানী তাঁর পোশাক ছিল। মাথায় জিন্নাহ টুপি পরতেন। লোহারী দরজার বাহিরে মুসলিম মসজিদের নিচে পুস্তক ব্যবসায়ী মৌলবী শামসুদ্দীনের দোকান ছিল। ৩/৪টা বাজার পর নতুন-পুরাতন বই সংগ্রহে আগ্রহী অনেকে সেখানে আসতেন। খুব আড্ডা জমত। আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানও অধিকাংশ সময় সেখানে আসতেন এবং সবাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনত।

আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমান নামে পরিচিত এই আপাদমস্তক মুহাক্কিক ১৩৯৮ হিজরীর ২৬শে যিলকদ (২৭শে অক্টোবর ১৯৭৮ খ্রিঃ) ৯০ বছর আয়ু পেয়ে করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন।

৭ম অধ্যায়

উর্দূ থেকে আরবী অনুবাদের কিছু দৃষ্টান্ত

উপমহাদেশের অসংখ্য আলেম বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষার বহু গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেছেন। ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঐ সকল আলেমের মধ্যে হানাফী ও আহলেহাদীছ উভয়েই শামিল আছেন। কিন্তু এখানে শুধু এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, নিকট অতীত বা বর্তমান যুগে কোন কোন উর্দূ গ্রন্থকে উপমহাদেশের কোন কোন আহলেহাদীছ আলেম আরবীতে রূপান্তর করেছেন। পূর্ববর্তী আলোচনার ন্যায় এই আলোচনাও সংক্ষিপ্তাকারে করা হবে। বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়।

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী[৯১] :

ভারতের উত্তর প্রদেশের (ইউপি) মৌনাথভঞ্জন শহরে ১৯৩৯ সালের ১৮ই আগস্ট (২২শে জুমাদাল আখেরাহ ১৩৫৮ হিঃ) ড. ছাহেবের জন্ম হয়। বুদ্ধি হওয়া মাত্রই তিনি জ্ঞানার্জনের পথে ধাবিত হন। অত্যন্ত সফলতার সাথে এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার ঈর্ষণীয় স্তরসমূহ পাড়ি দেন। অতঃপর নিজেকে পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত করেন এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেন। এই অধম তাঁর 'গুলিস্তানে হাদীছ' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ড. ছাহেব অসংখ্য উর্দূ ও ফার্সী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অন্যতম :

১. কুর্রাতুল 'আইনাইন ফী তাফযীলিশ শায়খায়ন (শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রচিত)।

২. আল-ইকসীর ফী উসূলিত তাফসীর (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান)।

৩. রহমাতুল্লিল আলামীন (কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান সালমান মানছূরপুরী), তিন খণ্ড।

---

৯১. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন : অনুবাদক প্রণীত মনীষী চরিত, মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০১০, পৃঃ ২৭-৩১।-অনুবাদক।

৪. তাহরীকে আযাদিয়ে ফিকর আওর শাহ অলিউল্লাহ কী মাসাঈ জামীলাহ (মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী)।[৯২]

৫. মাসআলায়ে হায়াতুন্নবী (ছাঃ) (ঐ)।

৬. যিয়ারাতে কুবূর (ঐ)।

৭. হুজ্জিয়াতে হাদীছ (ঐ)।

৮. জামা'আতে মুজাহিদীন (মাওলানা গোলাম রসূল মেহের)।

এ গ্রন্থগুলো ছাড়াও তিনি ড. ইয়াসীন মাযহার ছিদ্দীকী, শায়খ মুহাম্মাদ তাকী আমীনী ও আল্লামা মুছলেহুদ্দীন আ'যমীর কতিপয় গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন।

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী অধিক দরস প্রদানকারী, বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও ব্যাপক অধ্যয়নকারী আলেম ছিলেন। তিনি যেমন অসংখ্য উর্দূ ও ফার্সী গ্রন্থ আরবীতে রূপান্তর করেছেন, তেমনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আরবী গ্রন্থও উর্দূতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধমালা ও বিভিন্ন গ্রন্থের উপর লিখিত ভূমিকা সমূহের ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ হয়েছে। এভাবে আরবী, উর্দূ, হিন্দী, ইংরেজী চার ভাষাতেই তাঁর কাছ থেকে মানুষজন উপকৃত হন। আর এই চারটি ভাষাই তাঁর দেশ ভারতে প্রচলিত রয়েছে। হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষা। উর্দূও অনেকটা সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে এবং এটা পারস্পরিক যোগাযোগের ভাষাও বটে। ইংরেজীরও ওখানে প্রচলন রয়েছে। ওখানকার আলেম-ওলামা ও মাদরাসাওয়ালাদের জন্য আরবী ভাষার মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে। আরবদেরকে উপমহাদেশের আলেমদের ইলমী অবদানের সাথে পরিচিত করানোর জন্যও অনেক উর্দূ গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা আবশ্যক।

ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী ২০০৯ সালের ৩০শে অক্টোবর (১৪৩০ হিজরীর ১০শে যিলক্বদ) মৃত্যুবরণ করেন।[৯৩]

---

৯২. ড. আযহারী 'হারাকাতুল ইনতিলাক আল-ফিকরী ওয়া জুহূদুশ শাহ অলিউল্লাহ আদ-দেহলভী' শিরোনামে এটির আরবী অনুবাদ করেন। প্রথমত এই অনুবাদটি প্রবন্ধাকারে 'মাজাল্লাতুল জামে'আ সালাফিয়া'তে (বর্তমানে 'ছাওতুল উম্মাহ') প্রকাশিত হয়। পরে জামে'আ সালাফিয়া থেকে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় *(দ্র. ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৩৭৬)*।-অনুবাদক।

ড. আব্দুল আলীম বাস্তাবী :

ভারতের খ্যাতিমান মুহাক্কিকদের মধ্যে ড. ছাহেবকে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতের উত্তর প্রদেশের (ইউপি) সিদ্ধার্থনগরের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের নিকট থেকে কয়েকটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উর্দূ গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থ হল 'সীরাতুল বুখারী'। যেটি মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর প্রিয় রচনা। এই গ্রন্থটি ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই মুদ্রিত হয়। উপমহাদেশের আলেমদের মাঝে এটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। ড. আব্দুল আলীম বাস্তাবী এটাকে আরবীতে রূপান্তর করেন এবং এর অনেক স্থানে পাদটীকা লিখেন। যার কারণে তথ্য-উপাত্তের কলেবর এতো বৃদ্ধি পায় যে, গ্রন্থটি ২ খণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৪২৩ হিজরীতে এই আরবী অনুবাদটি মক্কা মুকাররমায় প্রকাশিত হয়।[৯৪]

দ্বিতীয় উর্দূ গ্রন্থটি মাসঊদ আলম নাদভীর। যাতে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)-এর জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম হল 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এক মাযলূম আওর বদনাম মুছলেহ'। ড. আব্দুল আলীম 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব মুছলেহুন মাযলূমুন ওয়া মুফতারা আলাইহি' নামে এর আরবী অনুবাদ করেন। এতেও অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজনের কারণে গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে এবং সঊদী আরবে অনেকবার মুদ্রিত হয়। আলেমগণ সাগ্রহে এটি অধ্যয়ন করেন।

মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ :

আমাদের বন্ধু মাওলানা ছালাহুদ্দীন বিন হাজী মাকবূল আহমাদ ১৯৫৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী বলরামপুর যেলার (ইউপি, ভারত) 'উনারহুওয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের 'নূরুল হুদা' মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

---

৯৩. তাঁর জীবনীর জন্য দেখুন : গ্রন্থকার রচিত 'গুলিস্তানে হাদীছ', পৃঃ ৩৮৫-৩৯৫।

৯৪. মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর জীবনীর জন্য লেখকের 'গুলিস্তানে হাদীছ' (পৃঃ ১৪৫-১৪৯) এবং ড. আব্দুল আলীম বাস্তাবীর জন্য 'দাবিস্তানে হাদীছ' (পৃঃ ৬১৯-৬২২) দেখুন। প্রকাশক : মাকতাবা কুদ্দূসিয়াহ, উর্দূ বাজার, লাহোর।

করেন। অতঃপর জ্ঞানার্জনের এই ধারাবাহিকতা সামনে অগ্রসর হয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সেখানে তিনি যেসব খ্যাতিমান শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন তাঁদের মধ্যে সঊদী আরব, মিসর, সুদান, ভারত ও পাকিস্তানের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণ রয়েছেন। পরে ১৯৮২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি কুয়েত চলে যান। এখনো সেখানেই আছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারত, কুয়েত ও সঊদী আরবের আলেমদের নিকট তিনি অত্যন্ত সম্মানিত। তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফীর উর্দূ গ্রন্থ 'জামা'আতে ইসলামী কা নাযরিয়ায়ে হাদীছ' এর 'মাওকিফুল জামা'আতিল ইসলামিয়্যাহ মিনাল হাদীছ' নামে এবং 'মাসলাকে ইমাম বুখারী' পুস্তিকার 'মাযহাবুল ইমাম আল-বুখারী ফী যূয়ি ছহীহিহি' নামে আরবী অনুবাদ করেন। তিনি মাওলানা সালাফীর আরো অনেক গ্রন্থ উর্দূতে রূপান্তর করছেন।

মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসীর একটি উর্দূ গ্রন্থও তিনি আরবীতে রূপান্তর করেছেন। তিনি সর্বদা লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত থাকেন।[৯৫]

মাওলানা মুহাম্মাদ উযাইর শামস :

মাওলানা মুহাম্মাদ উযাইর শামস উল্লিখিত তিনজন আলেমের চেয়ে বয়সে ছোট। তিনি ১৯৫৭ সালে মধুবনী যেলার (বিহার প্রদেশ, ভারত) বাণ্টুওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল মাওলানা শামসুল হক সালাফী। যিনি ১৯৮৬ সালের ৩রা জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম ও হাদীছের খ্যাতিমান শিক্ষকদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হত। অসংখ্য ব্যক্তি তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। তদীয় পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ উযাইর শামস খাঁটি ইলমী পরিবেশে লালিত-পালিত হন। নিজ দেশ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে করতে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে বিভিন্ন দেশের যোগ্য শিক্ষকদের নিকট থেকে ৪ বছর যাবৎ জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে 'তাখাছছুছ' ডিগ্রি অর্জনের সৌভাগ্য

---

৯৫. আমি 'গুলিস্তানে হাদীছ' গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৭-১৭০) মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছি। আর মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদের জীবন পরিক্রমার জন্য দেখুন : আমার গ্রন্থ 'দাবিস্তানে হাদীছ' (পৃঃ ৬২৩-৬৩৪)।

লাভ করেন । মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়ে মক্কা মুকাররমার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এভাবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই ইলম হাছিল করেন। এটা তার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁর ইলমী খিদমতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আরবী উর্দূ দু'ভাষাতেই তাঁর কলম সমানতালে চলে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করছেন এবং সুচারুরূপে তাছনীফী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

তিনি আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানের রচনাবলী ও তাহকীককৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আল্লামা যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এই প্রভাবের ফল এটা দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলো সংকলন করে 'বুহূছ ওয়া তাহকীকাত লিল-আল্লামা আব্দুল আযীয আল-মাইমানী' নামে ২ খণ্ডে প্রকাশ করেন।

মুহাম্মাদ উযাইর শামস অত্যন্ত সাহসী ও যোগ্য আলেম। সবসময় কোন না কোন গবেষণামূলক কাজে নিমগ্ন থাকেন। তিনি যেসব গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মুসাদ্দাসে হালীর গদ্যানুবাদ।

২. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর 'ইতহাফুন নাবীহ'।

৩. মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানবীর 'হিদায়াতুন নাজদাইন' (দুই ঈদের পরে করমর্দন ও কোলাকুলি বিষয়ে)।

৪. আল্লামা আব্দুল আযীয মাইমানের কতিপয় প্রবন্ধ।

৫. মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর 'মি'য়ারুল হক'।

৬. শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভীর 'ইযাহুল হক আছ-ছরীহ'।

আরবী পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে উযাইর শামসের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তিনি অনেক আরবী পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সঊদী আরবের যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি যুক্ত রয়েছেন সেগুলোর মধ্যে উম্মুল কুরা

বিশ্ববিদ্যালয় (মক্কা মুকাররমা), মুজাম্মাউল মালিক ফাহদ (মদীনা মুনাউওয়ারাহ) ও ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী (জেদ্দা) শামিল রয়েছে।[৯৬]

উর্দূ থেকে আরবীতে অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে করা হয়েছে। উপমহাদেশের অনেক আলেম এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা আমি সংগত মনে করিনি। তাই শুধু চারজন অনুবাদক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই চারজনই হিন্দুস্তানী। পাকিস্তানের আহলেহাদীছ আলেমদেরও এ ধরনের কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।

---

৯৬. জনাব মুহাম্মাদ উযাইর শামসের জীবনীর জন্য লেখকের 'কাফেলায়ে হাদীছ' (পৃঃ ৬৩৪-৬৪৫) এবং তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পিতা মাওলানা শামসুল হক সালাফীর জন্য একই গ্রন্থ (পৃঃ ২১৬-২২৬) দেখুন।

৮ম অধ্যায়

কুরআন ও হাদীছের হিন্দী অনুবাদ

ভারতের উত্তর প্রদেশের অসংখ্য মুসলমান পরিবারে বহু আলেম জন্মগ্রহণ করেছেন। যারা অপরিসীম ইলমী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সেই সৌভাগ্যবান পরিবারগুলোর মধ্যে মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী ফালাহীর পরিবার একটি। যার অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

মাওলানা খালেদ হানীফ ১৯৫৬ সালের জুলাইয়ে সিদ্ধার্থনগর যেলার (উত্তর প্রদেশ) ডোমার তহসিলের 'বায়তে নার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নাম মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ হাতিফ সাঈদী এবং সম্মানিত দাদার নাম ছিল শায়খ সা'আদাত আলী ছিদ্দীকী। শায়খ সা'আদাত আলী ছিদ্দীকী স্বীয় যুগ ও এলাকার আরবী ও ফার্সী জানা প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। যিনি সারাজীবন শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। নিজ গ্রাম বায়তে নার ও আশপাশের ডজন ডজন গ্রামের তিন প্রজন্মকে তিনি শিক্ষার অলংকারে অলংকৃত করেন।

মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকীর সম্মানিত পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ হাতিফ এবং দুই চাচা আব্দুশ শাকূর দাওর ছিদ্দীকী এবং হাফেয মুহাম্মাদ হুসাইন ছিদ্দীকী প্রসিদ্ধ আলেম ও খ্যাতিমান বক্তা ছিলেন।

খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী বাড়িতে কুরআন মাজীদ নাযেরানা পড়েন। উর্দূ ও হিন্দীর প্রাথমিক তা'লীমও বাড়িতে অর্জন করেন। অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য তাইয়িবপুরের নুছরাতুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে মুনশী আবেদ আলীর নিকট হিন্দী, অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং আরবী ও ফার্সীর প্রাথমিক সিলেবাস শেষ করেন। জামা'আতে ছালেছা বা তৃতীয় জামা'আত পর্যন্ত অন্য একটি মাদরাসায় আরবীর পাঠ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ, মাওলানা আব্দুশ শাকূর দাওর ছিদ্দীকী, মাস্টার আব্দুল করীম, মাস্টার আব্দুল মাজীদ এবং অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। এরপর জামে'আতুল ফালাহ, বলরিয়ায় (আযমগড়) ভর্তি হওয়ার সংকল্প করেন। ওখানকার শিক্ষকদের নিকট থেকে আলামিয়াত, ফাযীলাত ও তাখাছ্ছুছ কোর্স সমাপ্ত করে ১৯৭৬ সালে সনদ গ্রহণ করেন।

জামে'আতুল ফালাহ-তে তিনি মাওলানা জলীল আহসান নাদভী ইছলাহী, মাওলানা শাহবায আহমাদ হিন্দী, মাওলানা নিযামুদ্দীন ইছলাহী, শায়খুল আদাব মাওলানা আব্দুল হাসীব ইছলাহী, ফিক্বহের শিক্ষক মাওলানা ছাগীর হাসান ইছলাহী, মাওলানা সালামাতুল্লাহ, মাওলানা রহমাতুল্লাহ আছারী ও অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি দাওরায়ে হাদীছ-এর জন্য 'জামে'আ ফয়যে আম'-এ ভর্তি হন এবং মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান ফায়যীর নিকট থেকে সনদ ও 'ইজাযাহ' (পাঠদানের অনুমতি) লাভ করার মর্যাদা অর্জন করেন।

তিনি ১৯৭৭ সালে ফারেগ হন এবং ঐ বছরেই নূরুল হুদা মাদরাসায় (উনারহুয়া) শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এই মাদরাসায় তিন বছর প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় ওখানকার খতীব ও ইমামের দায়িত্বও তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। অতঃপর নূরুল হুদা মাদরাসায় (উনারহুওয়া) ইস্তফা দিয়ে 'গাড়ারহিয়া'র দারুল হুদা মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানেও প্রধান শিক্ষক এবং খতীব ও ইমামের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে এই এলাকায় তাবলীগী সফরও জারি রাখেন। এই সফরগুলো দারুণ ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। অমুসলিমদের নিকটেও ইসলামের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন।

এরপর দিল্লী চলে যান। ১৯৮০-১৯৮১ দুই বছর দিল্লীর দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ (সদর বাজার) মাদরাসায় শিক্ষক ছিলেন। ঐ সময় আহলেহাদীছ জামা'আতের একজন আলেম ক্বারী আব্দুল মান্নান-এর প্রচেষ্টায় বর্তমান আহলেহাদীছ কমপ্লেক্সে (দিল্লী) দারুল হাদীছ রহমানিয়া চালু হলে মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকীকে সেখানকার প্রধান শিক্ষক এবং শায়খুত তাফসীর ওয়াল আদাব নিযুক্ত করা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর মুখপত্র 'তারজুমান' পত্রিকার সাথেও যুক্ত থাকেন। অদ্যাবধি জমঈয়ত এবং তার 'তারজুমান' পত্রিকার সাথে যথারীতি যুক্ত আছেন এবং লিখিত খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। 'তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ' নামে ভারতের আহলেহাদীছ আলেমদের জীবনী সংকলনের কাজও অব্যাহত রয়েছে। এটা অনেক বড় খিদমত। যার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। আলেমদের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করা এবং বিশেষ পদ্ধতিতে সেগুলো বিন্যস্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে

মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করছেন।

মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী ফালাহী যে বিশাল বড় কাজ করেছেন, সেটা হল হিন্দী ভাষায় কুরআন মাজীদ ও হাদীছ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। এই উপমহাদেশে ইসলাম আসার কিছুকাল পর এখানকার আলেমগণ ফার্সীতে ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ করেন। উর্দূ ভাষা উন্নতি লাভ করলে পুরা ইসলামী সাহিত্যকে উর্দূতে রূপান্তরিত করা হয়। ইংরেজ শাসনের সময়ে এই ভূখণ্ডে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হলে ইসলামী বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষাগুলোকেও ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের সাথে পরিচিত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বাংলা, বালুচী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাসমূহ ইসলামের অনেক বড় মুবাল্লিগে পরিণত হয়। এ ভাষাগুলোর কারণে ইসলাম গদ্য ও পদ্যাকারে ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং নারী-পুরুষ সকলে ইসলাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করে।

উপমহাদেশের স্বাধীনতার পরে হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করলে মুসলিম বিদ্বানগণ আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন যে, ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তারা আরো একটি ভাষা পেয়ে গেলেন। এজন্য তারা যথারীতি এই ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং তাতে ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ করার দৃঢ় সংকল্প করেন। এমনটা মনে হচ্ছে যে, ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকীর অবদানই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। অদ্যাবধি তাঁর অনুবাদ সমূহের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল। এগুলো দিল্লীতে প্রকাশিতও হয়ে গেছে। প্রকাশক মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ।

১. কুরআন মাজীদ : মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর উর্দূ অনুবাদকে হিন্দীতে রূপান্তর করেন। প্রকাশক : মাকতাবায়ে তারজুমান, জামে মসজিদ, দিল্লী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪১৪।

২. কুরআন মাজীদ : উর্দূ অনুবাদ মাওলানা ফাতহ মুহাম্মাদ খাঁ জলন্ধরী। হিন্দী অনুবাদের সাথে উর্দূ অনুবাদও দেয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০০।

৩. ছহীহ বুখারী : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ৪ খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫০০।

৪. ছহীহ মুসলিম : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ২ খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০০।

৫. ছহীহ মুসলিম (মুখতাছারুল মুনযিরী) : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০০।

৬. সুনানে আবুদাঊদ : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ৩ খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০০।

৭. বুলূগুল মারাম : মাওলানা মুহাম্মাদ ছাদেক খলীলের উর্দূ তরজমার হিন্দী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। ২ খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০০।

৮. শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী হায়াত ওয়া খিদমাত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫৫।

৯. ফাতাওয়াল মারআহ (মহিলাদের মাসআলা-মাসায়েল)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫০।

১০. ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০০।

১১. বারাহ সূরা শরীফ (কুরআন মাজীদের বারটি সূরা। সংকলন : মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০।

১২. হিছনুল মুসলিম। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০।

১৩. আহকামুল জানায়িয (আল্লামা আলবানী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০১।

১৪. ইসলাম মেঁ হালাল ওয়া হারাম (আল্লামা কারযাভী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫০।

১৫. ছালাতুর রাসূল (হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫০।

১৬. ছালাতুন্নবী (প্রফেসর মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০০।

১৭. নামাযে নববী (ড. শফীকুর রহমান)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০০।

১৮. শামা মুহাম্মাদী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০।

১৯. আল-হাজ্জ ওয়াল উমরাহ (শায়খ বিন বায)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫০।

এই হল ১৯টি গ্রন্থ, যেগুলো মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদগুলো হাযার হাযার পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়ে আছে। মাওলানা খালেদ কুতুবে সিত্তাহর হিন্দী অনুবাদ করার দৃঢ় সংকল্প করেছেন।

এর মধ্যে ৪টি গ্রন্থ পাকিস্তানী লেখকদের। একটি হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটীর 'ছালাতুর রাসূল', দ্বিতীয়টি প্রফেসর মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানীর

'ছালাতুন্নবী', তৃতীয়টি মাওলানা মুহাম্মাদ ছাদেক খলীলকৃত বুলূগুল মারামের উর্দূ অনুবাদ, যেটি মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী হিন্দীতে রূপান্তর করেছেন। চতুর্থ গ্রন্থটি হল ড. শফীকুর রহমানের 'নামাযে নববী'। কুরআন মাজীদের হিন্দী অনুবাদের জন্যও সম্মানিত অনুবাদক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর উর্দূ অনুবাদকে নির্বাচন করেছেন। যিনি ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ সারগোধাতে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে এই সম্মানও পাকিস্তানের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমের ভাগ্যে জোটে।

ভারত সরকার কখনো ভারতের মুসলমানদের সঠিক সংখ্যা বলেনি। আদমশুমারী আদালতও মুসলিম জনসংখ্যার ব্যাপারে সর্বদা কারচুপি করেছে। ভারতের যেসব মুসলমানের সাথে কালে-ভদ্রে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে, তারা তাদের সংখ্যা ২৫ কোটির কাছাকাছি বলে। যাহোক ঐ সকল হিন্দী অনুবাদের দ্বারা হিন্দীভাষী মুসলমানেরা তো উপকৃত হচ্ছেনই; অসংখ্য অমুসলিমও ঐ অনুবাদগুলোর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচিত হচ্ছে। তাবলীগের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ইসলাম বেশি প্রসার লাভ করেছে। ইনশাআল্লাহ এই হিন্দী অনুবাদগুলোও অবশ্যই তার প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসারের মাধ্যম সাব্যস্ত হবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হল, মাওলানা খালেদ হানীফ ছিদ্দীকী একাই এত মর্যাদাপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর জন্য অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দো'আ বের হয়। এ জাতীয় ভাল কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরো বেশি তৌফিক দান করুন এবং তাঁর ও প্রকাশকের জন্য এই খিদমত ছাদাকায়ে জারিয়া সাব্যস্ত হৌক। এ ধরনের কার্যক্রম থেকে জানা যায় যে, ভারতের আহলেহাদীছ জামা'আত সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের অপরিসীম খিদমত করছে। ইনশাআল্লাহ তাদের এই খিদমত অবশ্যই ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। এই খিদমতকে আমরা আহলেহাদীছগণের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য করি। অবশ্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভারতের অন্যান্য জামা'আতের আলেমগণও সম্ভবত এ জাতীয় মৌলিক খিদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকবেন এবং দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা সে সম্পর্কে অবগত নই।

৯ম অধ্যায়

কতিপয় নগণ্য অগ্রগণ্য কৃতিত্ব

এই অধমও (ভাট্টি) ঐ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেমগণের পূত-পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী, যাদের অগ্রগণ্য কৃতিত্ব সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। কম আমল বরং বে-আমল (আমলহীন) হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি নবী-রাসূলগণ, সৎকর্মশীল বান্দাগণ, শহীদগণ ও অলি-আওলিয়ার পবিত্র জামা'আতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে পারি এবং করি, তাহলে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ আমাকেও এই অনুমতি দিবেন যে, আমিও আমার নগণ্য গবেষণামূলক রচনাগুলোর বিবরণ পেশ করব এবং ঐ খ্যাতিমান লেখকদের দলের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করব। কথিত আছে যে, এক বুড়ী কিছু সুতা নিয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর ক্রেতাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেউ তাকে ঐ লাইন থেকে বের করে দেয়নি। আমিও আমার লিখিত কিছু গ্রন্থের বিবরণ পেশ করলে তাতে দোষের কিইবা আছে। যদি বিদ্বানগণ এটা পছন্দ না করেন তাহলে সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু আমাকে তো আমার অভিরুচি প্রকাশ করার অধিকার লাভ করতে হবে।

১. **আল-ফিহরস্ত :** এই গ্রন্থটি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন নাদীম ওয়ার্রাক বাগদাদীর রচনা, যিনি ৩৯১ হিজরীর দিকে মৃত্যুবরণ করেন। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর জীবন অর্থাৎ ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারের জীবনী আলোচনা করেছেন। এতদ্বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন গ্রন্থ। এটিকে হাযার হাযার বছর পূর্বের গ্রন্থ ও গ্রন্থকার, মাযহাব ও মাসলাক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের 'বিশ্বকোষ' বলা উচিত। আমি এটির উর্দূ অনুবাদ করেছি এবং প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে হাশিয়া বা পাদটীকা লিখেছি। এটিই এই গ্রন্থের প্রথম উর্দূ অনুবাদ। যেটি নির্ঘণ্ট, ভূমিকা ও সূচীপত্রসহ সাড়ে নয়শ পৃষ্ঠাব্যাপী। (আমার উর্দূ অনুবাদের) পরে এর ফার্সী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

২. **বার্রে ছাগীর মেঁ ইলমে ফিক্বহ :** এই গ্রন্থে ঐ ১১টি পুস্তকের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে, ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত যেসব গ্রন্থ শতশত বছর পূর্বে ভারতীয় আলেমগণ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে ২টি গ্রন্থ প্রকাশিত

এবং ৯টি অপ্রকাশিত। এর মধ্যে কিছু আরবীতে ও কিছু ফার্সীতে রচিত এবং ইবাদত ও মু'আমালাত সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল সংবলিত। প্রত্যেকটি গ্রন্থ কয়েকশ পৃষ্ঠাব্যাপী। আমি ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করিনি; বরং মু'আমালাত সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি। শত শত বছর পূর্বের মুসলমান বাদশাহদের যুগে ভারতে কোন ধরনের মাসায়েল প্রচলিত ছিল এবং সেগুলো দ্বারা কীভাবে কর্তব্য পালন করা হত তা বর্ণনা করেছি। প্রত্যেক গ্রন্থের আরবী বা ফার্সী উদ্ধৃতি লিখে সাথে সাথেই সেগুলোর উর্দূ অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপমহাদেশে এটিই প্রথম গ্রন্থ। কিছু কিছু গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরের ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়, যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রথমে এই গ্রন্থটি ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া লিথো প্রেসে ছেপেছিল। বর্তমানে চমৎকার ডিজাইনে সোরাই, আল-হামদ মার্কেট, উর্দূ বাজার, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় চারশতে দাঁড়িয়েছে।

৩. **ফুকাহায়ে হিন্দ :** এই গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত। এতে ১ম হিজরী থেকে হিজরী এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাযার আলেম ও ফকীহ-এর জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে যারা যে তাদরীসী ও তাছনীফী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তার প্রাপ্ত বিবরণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি খণ্ডে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে ঐ শতাব্দীর ভারতীয় বাদশাহ ও শাসকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর যুগের আলেম ও ফকীহগণের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁদের সাথে আলেমদের কেমন যোগাযোগ ছিল। এতদ্বিষয়ে উর্দূতে এটিই প্রথম গ্রন্থ। অনেক বছর পূর্বে ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়াহ লিথো প্রেসে এটি প্রকাশ করেছিল। প্রত্যেক বছর ১ খণ্ড করে প্রকাশিত হয়েছিল। এভাবে এই দশটি খণ্ড ১০ বছরে মুদ্রিত হয়। বর্তমানে সেটি চমৎকার কম্পোজ ও উন্নত কাগজে কিতাব সোরাই (আল-হামদ মার্কেট, উর্দূ বাজার, লাহোর) থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

৪. **বার্রে ছাগীর মেঁ ইসলাম কে আওয়ালীন নুকূশ :** সোয়া দু'শ (২২৫) পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপমহাদেশের বাসিন্দারা হিজরী প্রথম শতকের গোড়ার দিকেই ইসলাম ও তাঁর মনোজ্ঞ সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে

গিয়েছিল। বর্তমান ভৌগলিক হিসাবে মুম্বাইয়ের নিকটবর্তী থানার বন্দর রাস্তায় ইসলামের আলো প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন সময়ে এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ২৫ জন ছাহাবী, ৪২ জন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাবেঈ এবং ১৮ জন তাবে তাবেঈ আগমন করেন।

৫. **বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আমাদ :** স্বীয় বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। যেটি সাড়ে তিনশ (৩৫০) পৃষ্ঠা সংবলিত।

৬. **বার্রে ছাগীর কে আহলেহাদীছ খুদ্দামে কুরআন :** সাতশ (৭০০) পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে উপমহাদেশের ঐ ১৮৫ জন আহলেহাদীছ আলেম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যারা আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজী, হিন্দী, সিন্ধী, বাংলা, বালুচী, পশতু, পাঞ্জাবী, সারায়েকী, মুলতানী বা অন্য কোন ভাষায় (গদ্য বা পদ্যাকারে) কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেছেন বা তাফসীর লিখেছেন বা তার বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত হাশিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক অনুবাদক, মুফাসসির ও টীকাকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটিও এই অধমের অগ্রগণ্য কৃতিত্বের শামিল। এর পূর্বে এ জাতীয় খিদমতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৭. **তাযকেরায়ে কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরী :** কাযী ছাহেব উপমহাদেশের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থকার ও সীরাত লেখক ছিলেন। উর্দূতে নবী করীম (ছাঃ)-এর পবিত্র জীবনী বিষয়ে তাঁর রচনা ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ তিন খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থটি দারুণ খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আরবী ও ইংরেজীতে এটি অনূদিত হয়েছে। কাযী ছাহেবের দুনিয়াবী মর্যাদাও অনেক উঁচু ছিল। তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় শিখ রাজ্য পাটিয়ালার সেশন জজ ছিলেন। আহলেহাদীছ জামা‘আতে তাঁর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে, তাঁকে অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের কতিপয় অধিবেশনে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি লিখিত স্বাগত ভাষণ পেশ করেন। তাঁর মৃত্যুর ৭৭ বছর পর এই অধম তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। যেটি ‘তাযকেরায়ে কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছূরপুরী’ নামে পাঁচশত (৫০০) পৃষ্ঠায় বিস্তৃত। গ্রন্থটিতে পাটিয়ালা রাজ্যের ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে।

৮. **তাযকেরায়ে ছূফী আব্দুল্লাহ :** দারুল উলূম তা‘লীমুল ইসলাম, উডানওয়ালা এবং জামে‘আ তা‘লীমুল ইসলাম, মামূঁকাঞ্জন (যেলা ফায়ছালাবাদ)-এর

প্রতিষ্ঠাতা ছূফী আব্দুল্লাহ্‌র জীবনী এই অধম লিখেছেন। যেটি সাড়ে চারশ (৪৫০) পৃষ্ঠাব্যাপী।

এভাবে কাফেলায়ে হাদীছ, কারওয়ানে সালাফ (পূর্বসূরিদের কাফেলা), দাবিস্তানে হাদীছ (হাদীছের পাঠশালা), গুলিস্তানে হাদীছ (হাদীছের ফুলবাগিচা), নুকূশে আযমাত রফতা (বিগত মহান মনীষীদের স্মৃতি), বাযমে আরজুমান্দা (জ্ঞানীদের মেলা), মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভীর জীবনী 'আরমাগানে হানীফ' (হানীফের উপহার), তাযকেরায়ে মাওলানা গোলাম রাসূল কিল'আবী, তাযকেরায়ে মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী, রোপড়ী ওলামায়ে হাদীছ, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী তাদরীসী আওর তানযীমী সারগুযাশত, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের কনফারেন্সসমূহে পঠিত স্বাগত ও সভাপতির ভাষণসমূহ, তাযকেরায়ে মাওলানা মুহিউদ্দীন লাক্ষাবী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কী আওয়ালিয়াত, যেটি সম্মানিত পাঠকের সামনে আছে। এখন 'চামানিস্তানে হাদীছ' (হাদীছের পুষ্পোদ্যান) লিখছি।[৯৭] ইনশাআল্লাহ এটিও কিছু দিনের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

আমি তো নিজের সম্পর্কে আরো কিছু লিখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু কলম সামনে এগুতে চাচ্ছে না। সে চায় না যে, নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলা হোক। ৬৪ বছর ধরে কলমের সাথে আমার সখ্যতা। এই দীর্ঘ সময়ে সে আমার সব কথা শুনেছে। যেদিকে আমি তাকে পরিচালিত করতে চেয়েছি সেদিকে দ্রুত চলতে শুরু করেছে। এখন সে আমাকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দিলে আমার নৈতিক দায়িত্ব হল থেমে যাওয়া। সবসময় আমার তার প্রয়োজন পড়ে। এমনটা যেন না হয় যে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই আমি তার নির্দেশ মেনে এসব ছোট ছোট কিছু নগণ্য অগ্রগণ্য কৃতিত্ব উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

---

৯৭. বর্তমানে তিনি ওকাড়ার বিখ্যাত 'লাখভী' আহলেহাদীছ পরিবারের ইতিহাস লিখছেন।-অনুবাদক।

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. আরবী কথোপকথন

২. ইসলামী পুনর্জাগরণ : পথ ও পদ্ধতি (অনুবাদ)
মূল : শায়খ উছায়মীন

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন

৪. ইসলামে হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা (অনুবাদ)
মূল : শায়খ আলবানী

৫. সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা (অনুবাদ)
মূল : শায়খ উছায়মী

৬. তারাবীহ ও ই'তিকাফ
মূল : শায়খ আলবানী

৭. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

৮. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (প্রকাশিতব্য)

৯. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান (প্রকাশিতব্য)

১০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত ও পদ্ধতি (প্রকাশিতব্য)

১১. ইছালে ছওয়াব ও ওরসের শার'ঈ ভিত্তি (প্রকাশিতব্য)

প্রাপ্তিস্থান

১। মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন- ৮৬১৩৬৫, মোবাইল- ০১৭৭০৮০০৯০০।

২। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী।

৩। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা
২২০ বংশাল রোড (২য় তলা)
১৩৮ মাজেদ সর্দার লেন, ঢাকা।
ফোন- ৯৫৬৮২৮৯, মোবাইল- ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

৪। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
আমীর সাধুর মার্কেট, উডল্যান্ডের পূর্ব পার্শ্বে
ইপিজেড মোড়, চট্টগ্রাম।
মোবাইল- ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

৫। তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল, ঢাকা-১১।
মোবাইল- ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬।

৬। ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী
রাণীবাজার, রাজশাহী।
মোবাইল- ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫।

***